নবিগণের (আ.) মানহাজ!

মুস্তফা হুসাইন

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ۗ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ

> "এরাই (নবিগণ) তারা, যাদেরকে আল্লাহ্ হিদায়াত করেছেন, কাজেই আপনি তাদের পথের অনুসরণ করুন। বলুন, 'এর জন্য আমি তোমাদের কাছে পারিশ্রমিক চাই না, এ তো শুধু সৃষ্টিকুলের জন্য উপদেশ।" (সূরা আল-আন'আম, ০৬:৯০)

আদম (আঃ) থেকে নিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সকল নবিগণের (আলাইহিমুস সালাম) জীবনের উদ্দেশ্য ছিল, জাতিকে এক আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের অধীনে নিয়ে আসা। যেন, আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের বিপরীতে কোনো ব্যক্তি, নেতা, পরিবার, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন বা রাষ্ট্রের আনুগত্য প্রাধান্য না থাকে; অর্থাৎ, এককভাবে কেবল আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যই হবে আবশ্যক।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

> আর আপনার পূর্বে এমন কোন রাসূল আমি পাঠাইনি যার প্রতি আমি এই ওহী নাযিল করিনি যে, 'আমি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই; সুতরাং তোমরা আমার ইবাদাত কর।' (সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:২৫)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

> "আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং পরিহার কর তাগূতকে।" (সূরা আন-নাহল, ১৬:৩৬)

সকল নবি (আলাইহিমুস সালাম) প্রেরিত হয়েছিলেন জমিনে তাওহিদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায়। প্রত্যেক ব্যক্তি, সত্তা ও শক্তির উর্ধ্বে জমিনে আল্লাহ তা'আলার দ্বীনকে প্রবল করার জন্যই নবিরা নিজ সংগীদের নিয়ে মেহনত করেছেন।

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ

> "আর কত নবি ছিল, যার সাথে থেকে অনেক আল্লাহওয়ালা লড়াই করেছে। তবে আল্লাহর পথে তাদের উপর যা আপতিত হয়েছে তার জন্য তারা হতোদ্যম হয়নি। আর তারা দুর্বল হয়নি এবং তারা নত হয়নি। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরকে ভালবাসেন।" (সূরা আলে ইমরান, ০৩:১৪৬)

শায়খ আবু কাতাদা আল ফিলিস্তিনি বলেন,

> "আল্লাহর দ্বীনে ইমামত বা নেতৃত্ব একটি কাঙ্খিত বিষয়। নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব (ইমামত) ব্যতীত পৃথিবীতে মুসলিমের ইবাদত বাস্তবায়িত হয়না। আর এখানে আমরা ইমামত ও ইমাম দ্বারা বুঝাচ্ছি, যা অর্জন হবে বিজয় ও শক্তির মাধ্যমে। ক্ষমতাশীল হওয়ার মাধ্যমে। তাই পৃথিবীতে মুসলমানদের তামকিন যত বৃদ্ধি পাবে, তাদের ইবাদতও

তত বৃদ্ধি পাবে। আর পৃথিবীতে মুসলমানদের ক্ষমতা যত হ্রাস পাবে, তাদের ইবাদতও তত হ্রাস পাবে।"

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কুরআনের এই আয়াত থেকে নবিগণের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আরো বিস্তারিতভাবে জানা যায়—

وَ جَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَ اِقَامَ الصَّلٰوةِ وَ اِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ ۚ وَ كَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ

"আর আমি তাদেরকে করেছিলাম নেতা; তারা আমাদের নির্দেশ অনুসারে মানুষকে সঠিক পথ দেখাতে; আর আমি তাদেরকে সৎকাজ করতে ও সালাত কায়েম করতে এবং যাকাত প্রদান করতে ওহী পাঠিয়েছিলাম; এবং তারা আমাদেরই ইবাদাতকারী ছিল।" (সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৭৩)

সুতরাং, তাওহিদের কর্তৃত্বের অন্যতম অর্থই হচ্ছে, জমিনে মানুষের সকল বিষয় নির্ধারিত হবে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশনা অনুযায়ী। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রে ভালো-মন্দ, করনীয়-বর্জনীয়, ব্যবস্থাপনাগত বা মূল্যবোধগত সকল কিছুই ঠিক করা হবে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা অনুযায়ী, কেননা এ পথে সাম্য, শান্তি, ইনসাফ ও ভারসাম্য নিশ্চিত। এ পথে অর্জিত হয় আত্মিক প্রশান্তি ও সামাজিক ভারসাম্য। যা আমাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিস্তারিত জানিয়েছেন, দেখিয়েছেন। পাশাপাশি, জাতির ইমাম নবি আলাইহিমুস সালামরা নিজেরাও ছিলেন ইবাদত ও আখলাকে সবার অগ্রগামী।

আর এতেও সন্দেহ নেই যে, নবিরা নিজ জাতিকে সর্বপ্রথম তাদের উপর চেপে বসা কর্তৃত্ববাদীদের কুফর ও জুলুমের কবল থেকে বের করে আনতে চেয়েছেন, কারণ তারাই তাওহিদের পথে প্রধান বাধা হয়ে থাকে। আর হিদায়াতের পথের প্রতিবন্ধকতাসমূহকে চিহ্নিত করে, তা থেকে মানবজাতিকে রক্ষার মেহনত ছাড়া ইবাদত নিশ্চিত করা সম্ভব না। প্রবৃত্তিপূজারী বিত্তশালী বা স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতাবানদের হাতে পিষ্ট মানবতাকে মুক্তি দেয়াও সম্ভব না।

وَ مَاۤ اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَاۤ ۙ اِنَّا بِمَاۤ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ

"আর আমরা কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করলেই তার বিত্তশালী অধিবাসীরা বলেছে, 'তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তার সাথে কুফরী করি।" (সূরা সাবা, ৩৪:৩৪)

وَ اِذَاۤ اَرَدْنَاۤ اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا

"আর আমি যখন কোন জনপদ ধ্বংস করতে চাই তখন সেখানকার সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদেরকে আদেশ করি, ফলে তারা সেখানে অসৎকাজ করে; অতঃপর সেখানকার প্রতি শাস্তির আদেশ ন্যায়সঙ্গত হয়ে যায় এবং আমরা তা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি।" (সূরা ইসরা, ১৭:১৬)

কুরআন মাজীদের বহুস্থানে বর্নিত হয়েছে, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের দাওয়াতের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম রুখে দাঁড়াতো সমাজের প্রভাবশালী শ্রেণী, যারা ছিল অর্থ-বিত্ত, সহায়-সম্পদ ও কর্তৃত্ব-ক্ষমতার অধিকারী। দৃষ্টান্তস্বরূপ — আল আনআম, ১২৩; আল আ'রাফ, ৬০, ৬৬, ৭৫, ৮০, ৯০; সূরা হুদ, ২৭; বনী-ইসরাঈল, ১৬; আল মু'মিমূন, ২৪, ৩৩ থেকে ৩৮, ৪৬, ৪৭ এবং আয যুখরুফ, ২৩ আয়াতসমূহ দেখা যেতে পারে।

সুতরাং, কর্তৃত্ববাদী কুফরি শক্তির অপসারণ ছাড়া তাওহিদ ও ইবাদত পরিপূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। এজন্যই জমিনে, তথা মানুষের উপর তাওহিদের কর্তৃত্ব ফিরিয়ে আনার জন্য কুফরী শাসনকর্তৃত্বের অপসারণ অপরিহার্য। নবিগণের (আ) আগমনের উদ্দেশ্যকে পূর্ণতা দানকারী, মানবজাতির জন্য রহমতরূপে প্রেরিত সর্বশেষ নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেরণের উদ্দেশ্য দ্ব্যর্থহীনভাবে স্পষ্ট করা হয়েছে—

هُوَ الَّذِیۡۤ اَرۡسَلَ رَسُوۡلَهٗ بِالۡهُدٰی وَ دِیۡنِ الۡحَقِّ لِیُظۡهِرَهٗ عَلَی الدِّیۡنِ کُلِّهٖ ؕ وَ لَوۡ کَرِهَ الۡمُشۡرِکُوۡنَ

"তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ সকল দ্বীনের উপর তাকে বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।" (সূরা আত-তাওবা, ০৯:৩৩)

আর এ উদ্দেশ্যেই নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদের (সা) উপর নাযিল হয়েছে কিতাব, যেন কুফরের অন্ধকার থেকে ইসলামের আলোয় মানবজাতিকে নিয়ে আসা হয়—

الٓرٰ ۟ کِتٰبٌ اَنۡزَلۡنٰهُ اِلَیۡکَ لِتُخۡرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوۡرِ ۙ بِاِذۡنِ رَبِّهِمۡ اِلٰی صِرَاطِ الۡعَزِیۡزِ الۡحَمِیۡدِ

"আলিফ-লাম-রা; এই কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষকে তাদের রবের অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আন, পরাক্রমশালী সর্বপ্রশংসিতের পথের দিকে।" (সূরা ইব্রাহিম, ১৪:০১)

সুতরাং, জমিনে ও মানুষের উপর আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল নবিগণের প্রধান উদ্দেশ্য। আর এ উদ্দেশ্যে নবিগণের রেখে যাওয়া জিম্মাদারি আদায়ের কারণেই উম্মতে মুহাম্মাদির শ্রেষ্ঠত্ব-

کُنۡتُمۡ خَیۡرَ اُمَّةٍ اُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَاۡمُرُوۡنَ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَ تَنۡهَوۡنَ عَنِ الۡمُنۡکَرِ وَ تُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ ؕ وَ لَوۡ اٰمَنَ اَهۡلُ الۡکِتٰبِ لَکَانَ خَیۡرًا لَّهُمۡ ؕ مِنۡهُمُ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ وَ اَکۡثَرُهُمُ الۡفٰسِقُوۡنَ

তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করবে। আর যদি আহলে কিতাব ঈমান আনত, তবে অবশ্যই তা তাদের জন্য কল্যাণকর হত। তাদের কতক ঈমানদার। তাদের অধিকাংশই ফাসিক। (সূরা আল-ইমরান, ৩:১১০)

এলক্ষ্যে আমৃত্যু নবিগণ চেষ্টা করে গেছেন, মানুষ যেন আল্লাহ তা'আলার বিধানের অধীনে চলে আসে। বিশেষত, মানবজাতির উপর থেকে কুফরের কর্তৃত্ব অপসারণ এবং ইসলামের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করাই ছিল নবিগণের প্রধান লক্ষ্য। কেননা, ব্যক্তি, সমাজ তথা গোটা মানবজাতির জন্য কিসে কল্যাণ, তা কেবলমাত্র সেই সত্তাই জানতে পারেন, যে সত্তা সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন।

اَلَا یَعۡلَمُ مَنۡ خَلَقَ ؕ وَ هُوَ اللَّطِیۡفُ الۡخَبِیۡرُ

"যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই কি জানবেন না? অথচ তিনি অতি সূক্ষ্মদর্শী, পূর্ণ অবহিত।" (সূরা আল-মুলক, ৬৭:১৪)

তাই, যে বা যারাই আল্লাহ তা'আলাকে রব্ব, স্রষ্টা হিসেবে মেনে নিয়েছে; তার জন্য ব্যক্তিগত, সামাজিক অঙ্গন থেকে নিয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার নিরংকুশ আনুগত্য মেনে না নেয়ার মানেই হচ্ছে—আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও কর্তৃত্বকে প্রত্যাখ্যান করা। উল্লেখ্য, আত্মিক দূর্বলতার কারণে কখনো কখনো আল্লাহ তা'আলার বিধান প্রতিপালন না করতে পারা এবং আল্লাহ তা'আলার বিধানকে অনুশোচনাহীনভাবে উপেক্ষা বা প্রত্যাখ্যান করা এক নয়। প্রথমটি ব্যক্তিকে ইসলামের গন্ডি থেকে বের করে না, কিন্তু পরবর্তী অবস্থানগ্রহণকারী ব্যক্তি মুসলিম থাকতে পারেনা।

দুনিয়াতে মানুষের উপর কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যই যেন কার্যকর থাকে; যেন আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত বিধানের ইনসাফ মানবসমাজের দুনিয়াবি জীবন ও আখিরাতের জীবনকে করে তোলে কল্যাণে পরিপূর্ণ, এটি নিশ্চিত করার জন্য কাজ করা আমাদের দায়িত্ব। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত বানিয়েছেন। এবং আমাদেরকে পাঠিয়েছেন মানবজাতিকে তার ইবাদতের দিকে নিয়ে আসার জন্য। তিনি বলেন:

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ لَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ اَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ

তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করবে। আর যদি আহলে কিতাব ঈমান আনত, তবে অবশ্যই তা তাদের জন্য কল্যাণকর হত। তাদের কতক ঈমানদার। তাদের অধিকাংশই ফাসিক। (সূরাঃ আল-ইমরান, ৩:১১০)

আর, নবিগণের পথের অনুসরণেই আসে প্রকৃত প্রশান্তি। যা কাড়ি কাড়ি টাকা, সুবিশাল অট্টালিকা কিংবা সুন্দরী নারী দ্বারা অর্জন করা যায় না!!

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

“মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকাজ করবে, অবশ্যই আমরা তাকে পবিত্র জীবন দান করব। আর অবশ্যই আমরা তাদেরকে তারা যা করত তার তুলনায় শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দেব।” (সূরা আন-নাহল, ১৬:৯৭)

সংখ্যাগরিষ্ঠ মুফাসসিরের মতে এখানে ‘হায়াতে তাইয়্যেবা’ বলতে দুনিয়ার পবিত্র ও আনন্দময় জীবন বোঝানো হয়েছে। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর অর্থ করেছেন স্বল্পে তুষ্টি। দাহহাক বলেছেন, হায়াতে তাইয়্যেবা হল ‘হালাল রিযক ও দুনিয়াতে ইবাদাত করার তাওফিক।’

আর নবিগণের পদাংক অনুসরণ করে জমিনে তাওহিদের দাবির বাস্তবায়ন হচ্ছে ঈমান ও নেক আমলের সর্বোচ্চ চূড়া; সকল নেক আমলই তাওহিদের মেহনতকে ঘিরে আবর্তিত হয়ে থাকে। যে বা যারাই নবিগণের পথ থেকে সরে গিয়ে, ইবাদতের পূর্ণতা বিধানের আমানতকে উপেক্ষা করে ব্যস্ত হয়ে পড়বে তার জন্য দুনিয়াতে থাকবে অতৃপ্ত, সংকীর্ণ জীবন।

وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّ نَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى

“আর যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ থাকবে, নিশ্চয় তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত।” (সূরা ত্ব-হা, ২০:১২৪)

অর্থাৎ, ইবাদতে গাফিলতির দরুণ তাদের দুনিয়ার জীবন সংকীর্ণ হবে। তাদের কাছ থেকে অল্পে তুষ্টির গুণ ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং সাংসারিক লোভ-লালসা বাড়িয়ে দেয়া হবে। যা তাদের জীবনকে অতিষ্ট করে তুলবে। ফলে তাদের কাছে যত অর্থ-সম্পদই সঞ্চিত হোক না কেন, আত্মিক শান্তি তাদের ভাগ্যে জুটবে না। সদা-সর্বদা সম্পদ বৃদ্ধি করার চিন্তা এবং ক্ষতির আশঙ্কা তাদেরকে অস্থির করে তুলবে। কেননা, সুখ-শান্তি অন্তরের স্থিরতা ও নিশ্চিন্ততার মাধ্যমেই অর্জিত হয়; শুধু প্রাচুর্য্যে নয়।

তাই, আখিরাত তো বটেই, দুনিয়াতেও যদি কেউ প্রশান্তির জীবন চায়; তার উচিৎ ইসলামকে ব্যক্তি, রাষ্ট্র ও বিভিন্ন দ্বীন-মতবাদসহ সমস্ত কিছুর উপর বিজয়ী করা। কেবলমাত্র এই মহান আদর্শ বাস্তবায়নই ব্যক্তি, সমাজ ও মানবতাকে সম্পদের অসম বণ্টন, স্বেচ্ছাচারীর আগ্রাসনসহ সকলপ্রকার জুলুমের নিষ্পেষণ থেকে নিস্কৃতি দিতে পারে। কেননা, তাওহিদের বাস্তবায়নই হলো আমাদের ইবাদতসমুহের মধ্যে সর্বোত্তম ইবাদত, যা আমাদের দান করবে হায়াতে তাইয়্যিবা। আর এটাই আল্লাহ তা’আলার সাহায্য পাওয়ার মাধ্যম।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ

“হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, তবে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা সমূহ সুদৃঢ় করবেন।” (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭:০৭)

আর আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করতে সাহায্য করতেই, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি চেয়েছেন মুমিনরা যেনো আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যায়।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا كُوۡنُوۡۤا اَنۡصَارَ اللّٰهِ

"হে ঈমানদারগন! তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও।" (সূরা আস-সফ, ৬১:১৪)

[২]

সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামি সভ্যতার কর্তৃত্ব এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, যার নজির ইতিহাসে আগে-পরে পাওয়া যায় না। এই কর্তৃত্ব বিভিন্ন মাত্রায় টিকে থাকে উনিশ শতক পর্যন্ত। তারপর, জাতির উত্থান পতনের সূত্রানুযায়ী আল্লাহ্ তা'আলা এই জাতির নেতৃত্ব খর্ব করলেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنۡۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَ مِنۡ خَلۡفِهٖ يَحۡفَظُوۡنَهٗ مِنۡ اَمۡرِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوۡا مَا بِاَنۡفُسِهِمۡ ؕ وَ اِذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوۡمٍ سُوۡٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَ مَا لَهُمۡ مِّنۡ دُوۡنِهٖ مِنۡ وَّالٍ

মানুষের জন্য রয়েছে, সামনে ও পেছনে, একের পর এক আগমনকারী প্রহরী, যারা আল্লাহর নির্দেশে তাকে হেফাযত করে। নিশ্চয় আল্লাহ কোন কওমের অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। আর যখন আল্লাহ কোন জাতির মন্দ চান, তখন তা প্রতিহত করা যায় না এবং তাদের জন্য তিনি ছাড়া কোন অভিভাবক নেই। (সূরা রাদ, ১৩:১১)

اَوَ لَمۡ يَهۡدِ لِلَّذِيۡنَ يَرِثُوۡنَ الۡاَرۡضَ مِنۡۢ بَعۡدِ اَهۡلِهَاۤ اَنۡ لَّوۡ نَشَآءُ اَصَبۡنٰهُمۡ بِذُنُوۡبِهِمۡ ۚ وَ نَطۡبَعُ عَلٰى قُلُوۡبِهِمۡ فَهُمۡ لَا يَسۡمَعُوۡنَ

জমিনের অধিবাসীদের (চলে যাবার) পর যারা তার উত্তরাধিকারী হয়, তাদের কাছে কি এ কথা পরিষ্কার হয়নি যে, আমি যদি চাই, তাদের পাপের কারণে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারি? (সূরা আরাফ, ৭:১০০)

ফলে মুসলিমদের কর্তৃত্ব খর্ব হল। পাশাপাশি, ইউরোপের ভোগবাদী জীবনাদর্শকে এই উম্মাহর অধিকাংশ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, বুঝে বা না বুঝে গ্রহণ করে নিলো। আমরা তাই দেখতে পাচ্ছি, উম্মাহ আজ শরীয়াহর বদলে গণতন্ত্রকে, কুরআনের বদলে মানবরচিত সংবিধানকে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বদলে শেখ মুজিব বা কামাল পাশাকে, আলেমদের পরিবর্তে সেক্যুলার বুদ্ধিজীবিদের বেছে নিয়েছে। যারা সচেতনভাবে বাতিলকে হকের উপর গ্রহণ করে নিয়েছে তাদের কুফর ও সীমালঙ্ঘনের বিষয়টি স্পষ্ট। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হল এই উম্মাহর সিংহভাগই গাফিলতি ও অজ্ঞতাবশত এই মরীচিকার পেছনে ছুটছে। ওয়াল্লাহুল মুস্তা'আন। উম্মাহর এই দুরবস্থার জন্য কাফের মুরতাদ মুনাফিক গোষ্ঠীর অনবরত চক্রান্ত এবং গোমরাহ, বেতনভোগী আলেম-দাঈরা যেমন দায়ী, একইভাবে উম্মাহর হিদায়াতপ্রাপ্ত ও বুঝদার অংশটির একক ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার অভাবও সমানভাবে দায়ী।

অক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে এই উম্মাহর মাঝে, পর্যাপ্ত সংখ্যক সুযোগ্য, মুখলিস দাঈ ইলাল্লাহর অভাবে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মুশি দাইয়্যান, থিওডর হার্জেল বা টি আই লরেন্স উদয়াস্ত পরিশ্রম করেছে, জীবনের উপর মৃত্যুকে প্রাধান্য দিয়েছে—খিলাফতের অবশিষ্টাংশটুকুও মুছে ফেলতে এবং ইহুদীদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায়। আর অব্যবহিত কাল পরেই তারা সফল হয়েছে। লেনিন, স্টালিন, ট্রটস্কিরা কারাগার আর নির্বাসনের মাঝে জীবন পার করা সত্ত্বেও অন্তঃসারশূন্য, বাস্তবতা বিবর্জিত এক মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র।

এমনকি, মাত্র ৪০ বছর পূর্বের স্থাপিত শিয়া-রাফিদা রাষ্ট্র ইরান মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি দোর্দণ্ড প্রতাপে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। নিজেদের চিন্তাধারা, রাজনৈতিক ও কূটনীতিক কর্মসূচীর প্রভাব পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্য ও পশ্চিম আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তার করতে তাদের

জেনারেলরা বিরামহীন সফরে জীবন অতিবাহিত করছে।

আর আফসোস হকের পতাকা বহনের দাবিদার এই উম্মাহর প্রতি। সমস্যা কেবল জনসাধারণের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকলেও হয়তো ক্রান্তিকাল এত দীর্ঘায়িত হতো না। এখনো মুসলিম ভূখণ্ডসমূহের কিছুসংখ্যক ছাড়া বাকিগুলোতে তাওহিদ ও ইসলামি বিপ্লবের অগ্রযাত্রা থমকে আছে। দুঃখজনকভাবে, আমাদের জাতিও এর ব্যাতিক্রম নয়।

তাই আমাদের শুরুর আলোচনার গুরুত্ব উপলব্ধি হয় যেখানে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক দুনিয়াতে নবিগণের (আ) প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল, মানুষকে একমাত্র আল্লাহর দাস বানানো, তাদেরকে বান্দাদের দাসত্ব থেকে বের করে আনা, পৃথিবী থেকে সমস্ত তাগুতদেরকে নির্মূল করা এবং পৃথিবীকে নৈরাজ্য থেকে মুক্ত করা।

উম্মাহর পূর্বসূরী ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা এই দ্বীন বুঝেছিলেন এবং তা পালনও করেছিলেন। ফলে এটা তাদের অন্তরে একটি বদ্ধমূল চিত্র ও অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গে পরিণত হয়। একারণে তারা রিসালাতের বুঝ ও ইলম সমস্ত বিশ্বে প্রবাহিত করতে পেরেছিলেন।

ইমাম তবারী রহিমাহুল্লাহ বলেন:

> "সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি. পারস্যের সেনাপতি রুস্তমের আবেদনের প্রেক্ষিতে হযরত রিবয়ী ইবনে আমর (রা.)-কে রুস্তমের উদ্দেশ্যে কাদিসিয়া অভিমুখে প্রেরণ করেন।
>
> তখন সে জিজ্ঞেস করল: তোমরা কী কারণে এসেছো?
>
> রিবয়ী রাযি. বললেন: আল্লাহ আমাদেরকে পাঠিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে নিয়ে এসেছেন, যেন আমরা তার বান্দাদের মধ্য হতে যাদেরকে তিনি চান, তাদেরকে বান্দাদের দাসত্ব থেকে তাঁর দাসত্বের দিকে নিয়ে যেতে পারি, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে আখেরাতের প্রশস্ততার দিকে নিয়ে যেতে পারি এবং সকল দ্বীনের (জীবনাদর্শের) জুলুম থেকে ইসলামের ইনসাফের দিকে নিয়ে যেতে পারি।
>
> তাই তিনি আমাদেরকে তার দ্বীন দিয়ে তার বান্দাদের নিকট প্রেরণ করেছেন, যেন আমরা তাদেরকে তার দিকে আহবান করি। সুতরাং যে আমাদের থেকে তা গ্রহণ করবে, আমরা তাকে মেনে নিবো, তার থেকে ফিরে যাবো এবং তাকে তার নেতৃত্বে বহাল রাখবো। আর যে তা প্রত্যাখ্যান করবে, আমরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবো, যতক্ষণ না আল্লাহর প্রতিশ্রুত বিষয়ের দিকে পৌঁছে যাই।
>
> সে জিজ্ঞেস করল: প্রতিশ্রুত বিষয় কী?
>
> বললেন: তা হলো, যে অবাধ্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নিহত হবে, তার জন্য আছে জান্নাত আর যে বেঁচে থাকবে, তার জন্য আছে বিজয়।"

তারপর উম্মতের উপর দিয়ে দীর্ঘকাল অতিক্রম করল। ফলে পিছুটান শুরু হলো। প্রতিশ্রুতি ভুলে যাওয়া হলো। যেন যুগ সে সময়ের দিকে ঘুরে গেল, যে সময় তা শুরু হয়েছিল। দ্বীন তার প্রাথমিক অপরিচিত অবস্থার দিকে ফিরে গেল। যেমন হাদিসের মধ্যে এসেছে:

> "ইসলাম অপরিচিত অবস্থায় শুরু হয়েছে। অচিরেই তা যেভাবে শুরু হয়েছে, সে অবস্থার দিকেই ফিরে যাবে। আর সেসকল অপরিচিতদের জন্য আছে সুসংবাদ।"

ইবনে খালদুনের ভাষায়—

> "যেন মহাবিশ্বের মুখপাত্র বিশ্বকে নিস্তেজতা ও সংকোচনের ডাক দিল, আর বিশ্ব সঙ্গে সঙ্গে তাতে সাড়া দিল।"

পৃথিবীর এই নিস্প্রভতার পর সংস্কারের প্রয়োজন হয়। সংস্কার তো সেই অস্পষ্টতার পরেই হয়ে থাকে, যাকে ভিন্নভাবে বলা যায় ইসলাম অপরিচিত হয়ে যাওয়া। এই সংস্কার ইতিপূর্বে করে থাকতেন নবিরা (আ), যার পূর্ণতা লাভ হয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে। তারপর সংস্কারের দায়িত্ব বর্তায় উম্মতে মুহাম্মাদি (সা.) এর উপর। যাদের পরিচয়,

وَ كَاَیِّنۡ مِّنۡ نَّبِیٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّیُّوۡنَ كَثِیۡرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوۡا لِمَاۤ اَصَابَهُمۡ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ وَ مَا ضَعُفُوۡا وَ مَا اسۡتَكَانُوۡا ؕ
وَ اللّٰهُ یُحِبُّ الصّٰبِرِیۡنَ

"আর কত নবি ছিল, যার সাথে থেকে অনেক আল্লাহওয়ালা লড়াই করেছে। তবে আল্লাহর পথে তাদের উপর যা আপতিত হয়েছে তার জন্য তারা হতোদ্যম হয়নি। আর তারা দুর্বল হয়নি এবং তারা নত হয়নি। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরকে ভালবাসেন।" (সূরা আলে ইমরান, ০৩:১৪৬)

'উকবা ইবন আমির (রাযি) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:لا تزال عصابة من أمتي
يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم، لايضرهم من خالفهم، حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك.
(صحيح مسلم).)

আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের একদল শত্রুদের পরাস্তকারী হয়ে আল্লাহর নির্দেশের উপর অবিচল থেকে, আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই চালিয়ে যাবে। তাদের বিরোধীরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কিয়ামত পর্যন্ত তারা এ অবস্থার উপর চলমান থাকবে'।[1]

নবিগণের (আ) আগমনের ধারা সমাপ্ত হবার পর, মানুষকে এক আল্লাহর দাসত্বে ফিরিয়ে আনার মহান দায়িত্ব বুঝে নেন নবি মুহাম্মাদ (সা.) এর পতাকাবাহীরা; যাদের প্রথম ব্যক্তি ছিলেন আস সিদ্দিক আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু। অতঃপর, যুগে যুগে নবিগণের উত্তরসূরীরা বারবার পতনের পর, আল্লাহর দ্বীনের উত্থান ঘটিয়েছেন। যা আল্লাহর নবি (সা.) এর নবুওয়াতের সত্যতার প্রমাণ বহন করে। কেননা আমাদের ইমাম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন,

عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على
الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون

'মুগিরা ইবন শু'বা (রাযি) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমার উম্মতের একটি সম্প্রদায় সর্বদা মানুষের উপর বিজয়ী থাকবে। আল্লাহর নির্দেশ (কিয়ামত) আসা পর্যন্ত তারা বিজয়ী থাকবে।" (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

যুগে যুগে নবিগণের মানহাজ আঁকড়ে ধরা আল্লাহওয়ালাদের কাফেলাই জমিনে হিদায়াতের চেরাগ জ্বালিয়ে রাখেন। কুফর ও জুলুমের বিরুদ্ধে অগ্রগামী বাহিনী হিসেবে ইসলামের পতাকা বহন করেন।

বারবারই, উম্মাহ তাওহিদের দাবি থেকে সরে গিয়ে নিজেদের ভুলের মাশুল দিয়েছে আর নবিগণের প্রকৃত উত্তরসূরীরা দাঁড়িয়ে গেছেন, বিপরীত দিকে ঘুরে যাওয়া ঘড়ির কাঁটা সঠিক পথে ফিরিয়ে দিয়েছেন। মুতাজিলা, ক্রুসেডার, রাফেজি বা তাতারদের ফিতনার মতো ভয়াবহ বিপর্যয় থেকে আল্লাহর দ্বীন ও উম্মতকে সুরক্ষা দিতে এগিয়ে এসেছেন নবিজীর পতাকাবাহীরা। যেমন—আবু বকর, সালাহউদ্দিন আইয়ুবী, ইবনে তাইমিয়া, সাইফুদ্দিন কুতুজ বা মুহাম্মাদ ইবন আব্দিল ওয়াহহাব (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) প্রমুখ ইমামগণ। রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

এখন সময় এসেছে নবিগণের উত্তরাধিকারী, নেককার পূর্বসূরীদের ন্যায় পুনরায় জাতিকে সংস্কারের। পাশাপাশি এও উল্লেখ্য, তাওহিদের কর্তৃত্ব কেবল রাজনৈতিক, জ্ঞানগত বা অর্থনৈতিক কর্তৃত্বের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। নবিগণের উদ্দেশ্য এমন সীমাবদ্ধ ছিল

না। বরং, সকল ক্ষেত্রেই তাওহিদের শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিত করাই ছিল নবিগণের উদ্দেশ্য, যার প্রধানতম বাধা ছিল জাতির মাঝে কুফরের কর্তৃত্ব। তাই, সমাজের কুফরের নেতাদের কর্তৃত্বকে ইসলামের কর্তৃত্ব দ্বারা প্রতিস্থাপন করাই নবিগণের প্রধানতম লক্ষ্য ছিল; কিন্তু মূলত, নবিগণের সামগ্রিক লক্ষ্য ছিল মানুষকে নিজের খেয়ালখুশি, সকলপ্রকার ভ্রান্ত চিন্তা ও সীমালঙ্ঘনকারীর (চাই উক্ত ব্যক্তি বা সত্তা হোক নিজ পিতা, পরিবার, পীর, শাসক বা মুরুব্বি) আনুগত্য থেকে মুক্ত করে এককভাবে আল্লাহর আনুগত্যের অধীনে নিয়ে আসা।

এবিষয়টি ভুলে যাওয়ার কারণেই, কোনো কোনো গোষ্ঠী কেবল রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অর্জনকে লক্ষ্য সাব্যস্ত করে, ভ্রান্ত আকিদা ও মতবাদসমূহকে মেনে নিয়েছে। রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্য সকলপ্রকার আপোষ ও হীনমন্যতা মেনে নিয়ে তারা অগ্রসর হচ্ছেন, অথচ নিজেদেরকে মানহাজুল আম্বিয়ার পতাকাবাহীও মনে করছেন। আবার, অনেকেই কেবল মুসলিমদের মাঝে বিদ্যমান কিছু ভ্রান্ত চিন্তার অপনোদন আর শাখাগত মাসআলার বিতর্কে মশগুল হয়ে কুফরের রাজনৈতিক ও সামগ্রিক আনুগত্যের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে রয়েছে!!

তাই নববি মানহাজের অনুসারীদের জন্য সকলপ্রকার বাতিলের অপসারণে ফিকর ও মেহনত করা জরুরী, যেন দ্বীন কেবল আল্লাহর জন্যই হয়ে যায়। তবে, অবশ্যই কুফর ও বাতিলের মাত্রা অনুযায়ী ধারাবাহিকতা ও সমন্বয় গুরুত্বপূর্ণ। আর এজন্যই, শরীয়াহসম্মত সম্ভাব্য সকল পদ্ধতিতে কুফরের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অপসারণ এবং জাতির ধারাবাহিক ঈমানী ও চিন্তাগত পরিশুদ্ধির আন্দোলনই তাওহিদ প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

শায়খ আবু কাতাদা আল ফিলিস্তিনি বলেন,

> “নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মাঝে নবিগণের কর্মতৎপরতার কুরআনী বিবরনের মাধ্যমে ফুটে উঠে যে, তারা সকলেই একটি মৌলিক বিষয়ে এক ছিলেন। এটাই সেই হাদিসের কথা, যাতে বলা হয়েছে—
>
> ‘মানুষের সাথে নবিগণের লড়াই ও সংঘাতের উদ্দেশ্য ছিল মানুষের মাঝে আল্লাহর ‘উবুদিয়্যাহ’ বা দাসত্ব প্রতিষ্ঠা করা।’
>
> ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে মানুষ সবচেয়ে বড় যে বিপদে আক্রান্ত হয়, তা হল শিরক। এটা মানবজীবনের সবচেয়ে বড় জুলুম বা অন্যায়।
>
> আল্লাহ তা’আলা বলেন:
>
> {إن الشرك لظلم عظيم}
>
> “নিশ্চয়ই শিরক ভয়াবহ জুলুম।”
>
> নবিগণের লড়াই ছিল এই বক্রতাকে সোজা করার উদ্দেশ্যে এবং তাকে সঠিক পথে, অর্থাৎ তাওহিদের পথে ফেরানোর উদ্দেশ্যে। যেহেতু নবিগণ আল্লাহর দূত ও তাঁর দাস, একারণে তারা সর্বপ্রথম যে দায়িত্বটি পালন করেন, তা হল পৃথিবীতে তাওহিদ প্রতিষ্ঠা করা এবং এই সুরক্ষিত বিষয়ের ক্ষেত্রে মানুষ যে অন্যায়ে লিপ্ত হয়ে পড়েছে তা মানুষের সামনে উন্মোচন করা।
>
> যদিও এটা এমন এক অন্যায় আরো বহু অন্যায়ের জনক—যেমন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জুলুম ইত্যাদি। কিন্তু প্রথম হকটির সংশোধন ছাড়া এসবগুলোর সংশোধন আলাদাভাবে হওয়া সম্ভব নয়।...
>
> এই শিকড়টি পাশ কাটিয়ে গেলে একজন মুসলিম আল্লাহর সেই দাসত্ব থেকে দূরে সরে যাবে, যা তার কর্তব্য ছিল। আর সেই কর্তব্য হল নবিগণের দাওয়াতের বাস্তবায়নকারী হওয়া।
>
> সরাসরি বলতে গেলে বলতে পারি, একজন মুসলিম যখন সামাজিক বিশৃঙ্খলাগুলো দূর করার জন্য নিজেকে

> একজন সমাজ সংস্কারকরূপে দাঁড় করায়, অথবা রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলাগুলো দূর করার জন্য নিজেকে একজন রাজনৈতিক সংস্কারক রূপে দাঁড় করায়, অথবা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়নের জন্য নিজেকে একজন অর্থনীতি বিশেষজ্ঞরূপে দাঁড় করায়। তখন এই ভূমিকাগুলোর মাঝে কুরআনে বর্ণিত নবিগণের মেহনতের প্রধান চিত্রটির অনেকগুলো নিদর্শন অনুপস্থিত দেখা যায়।
>
> এর আলোকে আমরা প্রতিটি ইসলামি দলের প্রকৃত রূপ জানতে পারি; অর্থাৎ তারা কুরআনে বর্ণিত নবিগণের দাওয়াত থেকে কতটা নিকটে বা কতটা দূরে। আমরা স্মরণ করতে পারি যে, নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সাথে নবিগণের যুদ্ধটি ছিল শিরকের মোকাবেলায় তাওহিদের যুদ্ধ। অর্থাৎ তাওহিদের পতাকাতলে যুদ্ধ।”

তাই, সমাজে তাওহিদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই মূলত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার সম্ভব। মৌলিক দাওয়াতকে পাশ কাটিয়ে শাখাগত সংস্কারের চিন্তা হবে নবিগণের দাওয়াতের বিপরীত অবস্থান। এখন যদি আমরা তাওহিদের বিপ্লব চাই; যেমন চেয়েছিলেন নবিগণ (আলাইহিমুস সালাম); তাহলে করণীয় কী?

কিভাবে নবিগণের লড়াইয়ের পূর্ণতা বিধান সম্ভব হবে?

কিভাবে এই মহান উদ্দেশ্য তথা জাতির মাঝে তাওহিদ প্রতিষ্ঠা পুনরায় সম্ভব হবে??

এজন্য অপরিহার্য সঠিক আকিদা, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও ধারাবাহিক অগ্রগতির মাধ্যমে বিপ্লব সম্পন্ন করা। আর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ মেহনত হবে সঠিক সংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমে।

কেননা, কোনো দাওয়াত টিকে থাকা, স্থায়ী হওয়া এবং তারও পূর্বে প্রচার-প্রসার লাভের জন্য সংগঠিত হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং কোনো জামাত, গ্রুপ বা দল থাকা ছাড়া কোনো চিন্তাধারাই অস্তিত্বে আসে না বা টিকে থাকে না। যদি ক্ষুদ্র জামাআতেরও অস্তিত্ব না থাকে, তাহলে তামকিন (কর্তৃত্ব) লাভ এমন বিষয়, যা কল্পনাও করা যায় না।

তাই প্রয়োজন হলো—নববি দাওয়াহ, মানহাজ ও রব্বানী নেতৃত্বের অধীনে সংগঠিত মেহনত!

[৩]

আমরা আজ এমন এক পরিস্থিতিতে বসবাস করছি, যখন শত্রুরা খ্যাপা কুকুরের মতো আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, ক্রমাগত আক্রমণ ও বহুমুখী ষড়যন্ত্র হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে উম্মাহর জন্য আবশ্যক হল তাদের শক্তিগুলোকে একত্রিত করা এবং প্রচেষ্টাগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করা। উম্মাহ আজ তার প্রতিটি সৈন্য, প্রত্যেক আলেম এবং সঠিক সিদ্ধান্তের অধিকারী প্রত্যেক জ্ঞানীর প্রতি মুখাপেক্ষী। এই যখন উম্মাহর অবস্থা, তখন উম্মাহ তাদের মহান সেনাপতি ও সম্মানিত নেতৃবৃন্দের প্রতি কতটা মুখাপেক্ষী?

নিশ্চয়ই সফল জাতি তারাই, যারা তাদের বড়দের মর্যাদা বোঝে, তাদের হেফাজত করে ও তাদেরকে তাদের উপযুক্ত স্থানে আসন দান করে। আর জামানার এই মহান ব্যক্তিরাই হচ্ছেন নবিগণের পতাকাবহনকারীরা; যারা আবু বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), আহমাদ ইবন হাম্বল, ইবন তাইমিয়া ও মুহাম্মাদ ইবন আব্দিল ওয়াহহাবদের প্রকৃত অনুসারী।

শয়তানের অনুসারীদের সর্বাত্মক চেষ্টার ফলস্বরূপ—সর্বব্যাপী কুফর, জুলুম ও ভ্রান্ত চিন্তার মহামারী সত্ত্বেও, সমাধান তাই আমাদের সামনেই রয়েছে! আর তা হচ্ছে, নবিগণের প্রকৃত উত্তরসূরীদের মানহাজকে আঁকড়ে ধরা। ইতিহাস ও সময় আমাদের সাক্ষ্য দেয় বর্তমান সময়ে নবিগণের মানহাজের উপর উম্মতকে দিকনির্দেশনা ও নেতৃত্ব দানকারী মহান ব্যক্তিরাই জাতিকে অন্ধকারের মাঝে আলো দেখাচ্ছেন। ফা লিল্লাহিল হামদ।

তাঁরা প্রমাণ করেছেন, আদর্শের বিজয় কেবল তত্ত্বকথার মাধ্যমে আসে না। বিজয় ও কর্তৃত্ব আসে আদর্শের গভীর উপলব্ধি, সঠিক মানহাজের আলোকে সংগঠিত হওয়া এবং সেপথে অবিচল থাকার মাধ্যমে। তাই, যুগে যুগে হিদায়াতের ইমামরা শুধু তত্ত্ব উপস্থাপন

করেই দায়িত্বপালন শেষ করেন নি, বরং নবিগণের মানহাজ অনুযায়ী সংগঠিত মেহনতও করেছেন।

আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করেই বলা যায়, আমাদের সময়ে নবিগণের মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত আন্দোলনের রূপরেখা প্রণয়ন ও নেতৃত্ব দানকারী ব্যক্তিরা হচ্ছেন—শায়খ আবদুল্লাহ আজ্জাম, ইমাম উসামা আবু আবদুল্লাহ, শায়খ ডক্টর আবু মুহাম্মাদ আইমান, শায়খ আবু মুসআব, শায়খ আবু কাতাদা আল ফিলিস্তিনি, শায়খ আবু মুহাম্মাদ আল মাকদিসি প্রমুখরা।

এই মহান ব্যক্তিরাই উম্মতকে নববি মানহাজের আলোকে সেই আন্দোলনের পথ দেখিয়েছেন, যে পথে সফলতালাভ সম্ভব। যার দৃশ্যমান প্রভাব ইয়েমেন, আফগানিস্তান, সোমালিয়া, মালি এবং অন্যান্য কিছু স্থানে দেখা গেছে। ইন শা আল্লাহ সামনে আরও দেখা যাবে। আপাতদৃষ্টিতে এখনো বিমূর্ত মনে হলেও, এই মুবারাক আন্দোলনের বাস্তব প্রভাব গোটা দুনিয়াতেই বিদ্যমান।

কেননা, সময়ের ইমামদের দেখানো পথে পরিচালিত আন্দোলনগুলো যেখানে প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করেছে, সেখানে রাব্বুল আলামিনও স্বীয় ওয়াদা বাস্তবায়ন করেছেন!

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْـًٔا وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ

> তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে এ মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি নিশ্চিতভাবে তাদেরকে জমিনের প্রতিনিধিত্ব প্রদান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি তাদের ভয়-ভীতি শান্তি-নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেবেন। তারা আমারই ইবাদাত করবে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর এরপর যারা কুফরী করবে তারাই ফাসিক। (সূরা নুর, ২৪:৫৫)

বিগত তিন যুগে মুসলিম দেশগুলোতে যে আন্দোলনগুলোই ইমামদের নববি মানহাজ জেনেছে, বুঝেছে ও আঁকড়ে ধরেছে তারাই কামিয়াবির পথে এগিয়েছে। যে বা যারাই সময়ের ইমামদের মানহাজ থেকে নিজেকে যতটুকু সরিয়ে নিয়েছে, তারা ততটুকুই ব্যর্থতার স্বীকার হয়েছে।

আমরা যদি আমাদের ভূখণ্ডে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদার বাস্তবায়ন দেখতে চাই, ইসলামের শাসন ও কর্তৃত্ব ফিরিয়ে আনতে চাই; তবে ইসলামি আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে—নবিগণের উত্তরসূরী, জামানার ইমামদের মানহাজ ও দিকনির্দেশনার অনুসরণই কাম্য।

কী সেই মানহাজ?

এর উত্তর হল—শারঈ ও সার্বজনীন মূলনীতির আলোকে—অগ্রগামী জামাআতের নেতৃত্বে সুসংগঠিত মেহনত। যে বৈপ্লবিক কর্মসূচি পরিচালিত হবে জাতির উপর চেপে বসা সেক্যুলার কুফরী শাসনের আধিপত্য অপসারণ এবং জাতির মাঝে তাওহিদি চেতনা ব্যাপক করার লক্ষ্যে। যে মানহাজের অনুসারীরা কুফরী শাসনের পতন হোক বা না হোক, সমাজে নবিগণের দাওয়াহ তথা তাওহিদের চেতনাকে প্রবল করতে ভূমিকা রেখেই যাবে.... যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলার সাথে মিলিত হওয়ার সময় আসে!

উল্লেখ্য, কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের নিজস্ব দাবি দ্বারা, অথবা নিছক কোন নাম ও পরিভাষার সাথে সংশ্লিষ্টতা থেকে কোনোকিছু সাব্যস্ত হয় না। বরং, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখা হবে দাওয়াত ও মেহনতেরর বস্তুনিষ্ঠতা এবং মানহাজ।

সঠিক বিপ্লবী সংগঠনই আমাদের জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানসিক পদস্খলনগুলো বুঝার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে এবং এমন এক ভবিষ্যৎ পৃথিবীর চিন্তা লালন করে, যাকে নেতৃত্ব দিবে ইসলাম।

একারণে বিপ্লবী সংগঠনের জন্য আদৌ গ্রহণযোগ্য নয় যে, তারা তাওহিদের প্রতি গুরুত্বারোপ করবে না। কেননা বহু ইসলামপন্থী জামাত এমন পরিবেশে বেড়ে উঠে, যেখানে ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতা বিদ্যমান। কিন্তু তারা এগুলোর দিকে মাথা তুলেও তাকায় না। যেন এসকল সংগঠনগুলো হলো স্রেফ রাজনৈতিক সংগঠন। আর শুধুমাত্র রাজনৈতিক কাজের উপায়সমূহের একটি উপায় হিসেবে জিহাদ বা বিপ্লবের পথ বেছে নিয়েছে।

আমাদের জাতি ও সমাজের মাঝে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক বিচ্যুতিগুলোর প্রতিকারে বিপ্লবী আন্দোলনের পক্ষ থেকে সঠিক মানহাজের পরিপূর্ণ উপস্থাপনা খুবই জরুরী। কারণ বিপ্লবী আন্দোলনই অন্যান্য একসময় ইসলামি সংগঠনগুলোকে এমন শারঈ রূপ প্রদান করতে সক্ষম, যা সামগ্রিকভাবে ইসলামি আন্দোলনকে সাহাবাদের প্রজন্মের কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারে!

তাই যে কোনো বিপ্লবী আন্দোলন বা জিহাদি আন্দোলনই কেবল নাম, পরিভাষা ও দাবির কারণে ঢালাও আনুগত্যের উপযোগী হবে না। বরং দেখা হবে তাদের দাওয়াহ, মানহাজ, মানসিকতা ও লক্ষ্য অর্জনে সক্ষমতার দিকগুলোও।

অতএব, শারঈ, ঐতিহাসিক ও বাস্তবিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নবিগণের উত্তরসূরী, তাওহিদের ইমামদের প্রস্তাবিত মানহাজের স্বরূপ নিয়ে আসলে কি?

শায়খ আবদুল্লাহ আজ্জাম বলেন,

> “অতএব, যারা কুফরের সাথে সংঘাতের চিন্তা বাদ দিয়ে ইসলামি আন্দোলনের কর্মী জনসংখ্যার শতকরা দশ ভাগ বা বিশ ভাগে পৌছার অপেক্ষা করে; এবং বলে যে, ‘শতকরা দশ কিংবা বিশ ভাগ জনগণ যখন ইসলামি আন্দোলনের কর্মী হবে, তখন ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করব’, তারা সমাজের প্রকৃতি, দাওয়াতের নীতি ও পৃথিবীতে আল্লাহর সৃষ্টিগত সুন্নাহ উপলব্ধি করেনি ।
>
> ইসলামি আন্দোলনের কর্মী সংখ্যা জনসংখ্যার একশ ভাগের পাঁচ কিংবা দশ ভাগে এসে পৌঁছা কখনোই সম্ভব না। এটা অবাস্তব স্বপ্ন ছাড়া কিছুই না।
>
> রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের দিকে দেখুন।
>
> মক্কার তের বছরে তাঁদের সংখ্যা ছিল শতের কাছাকাছি।
>
> জিহাদের পথে অগ্রসর হওয়ার পর বদরে গিয়ে তাঁদের সংখ্যা দাঁড়াল ৩১৩ (তিনশ তের) জনে।
>
> উহুদে গিয়ে তাঁদের সংখ্যা দাঁড়াল ৭০০ (সাতশ) এ।
>
> হুদাইবিয়ায় গিয়ে তাঁদের সংখ্যা এসে উপনীত হয় ১৪০০ (চৌদ্দশ) এ।
>
> মক্কা বিজয়ের দিন তাঁদের সংখ্যা হয় ১০০০০ (দশ হাজার) ।
>
> কেন এত বিরাট পার্থক্য!?
>
> ষষ্ঠ হিজরীতে হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় সাহাবীদের সংখ্যা ছিল ১৪০০। কিন্তু মক্কা বিজয়ের দিন দশ হাজার হল, কীভাবে?
>
> এর কারণ, যুদ্ধে হেরে কুরাইশরা তাঁদের দম্ভ অহংকারকে খুইয়ে স্বীকার করে নিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই কর্তৃত্বের অধিকারী। তাই তারা তাঁর হাতে কর্তৃত্বের চাবি তুলে দিতে বাধ্য হয়। হুদাইবিয়ার সন্ধি আরব দ্বীপে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রাজনৈতিক প্রভাব বহুগুণে বৃদ্ধি করল। ফলে মানুষ আল্লাহর দ্বীনে দলে দলে প্রবেশ করা শুরু করল। কারণ, মানুষের ইসলামগ্রহণে কুরাইশদের দম্ভ ও আল্লাহর দ্বীনের সাথে তাঁদের শত্রুতা বড় বাঁধা ছিল।

হুদাইবিয়ার সন্ধির মাধ্যমে কুরাইশরা যখন তাঁদের দম্ভ অহংকার থেকে হটে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে চুক্তি করতে বাধ্য হল, তখন জনসাধারণ মনে করল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিজয় অনিবার্য। ফলে তাঁরা ব্যাপক ভাবে ইসলামে দীক্ষিত হতে শুরু করে। অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয় হল এবং কুরাইশরা পরাজয় স্বীকার করে নিল।

মক্কা বিজয় রমযানে হয়েছিল। নবম হিজরীর জুমাদাল উখরা বা রজব মাসে তথা মক্কা বিজয়ের নয় মাস পর তাবূক অভিযান পরিচালিত হয়। মুসলমানদের সংখ্যা মক্কা বিজয়ের দিন দশ হাজার ছিল। কিন্তু তাবুক অভিযানের সময় মুসলমানদের সংখ্যা এসে দাঁড়ায় ত্রিশ হাজারে। বিপুলভাবে বর্ধমান এ সংখ্যা মুসলমানদের সামরিক-রাজনৈতিক বিজয়েরই ফল। দশম হিজরীর শেষের দিকে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ করতে গিয়েছিলেন, তখন মুসলমানদের সংখ্যা এসে পৌঁছে এক লক্ষ চৌদ্দ হাজারে।

শক্তিশালী না হলে মানুষ আপনার পক্ষ নিবে না। দুর্বলতা ও কষ্টের সময় গণমানুষের পক্ষে আপনার সাথে এসে দাঁড়ানো কল্পনাতীত ব্যাপার। কারণ, গণমানুষ অবস্থা দেখেই ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

আল্লাহ বলেছেন—

“যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এসে গেল, আর আপনি মানুষকে দেখছেন, তারা আল্লাহর দ্বীনে দলে দলে প্রবেশ করছে।”

আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়ের পরই মানুষ আল্লাহর দ্বীনে গণহারে দীক্ষিত হয়। দুর্বলতা ও কঠিন পরিস্থিতির সময় কেবল সেসব দুর্লভ ও অনন্য-সাধারণ লোকেরা তোমার পাশে থাকবে, যারা ত্যাগ ও মৃত্যুর জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে।”

আমাদের এই ইমাম আরো বলেন,

“সমাজবিপ্লব, জাতি গঠন ও সম্মান পুনরুদ্ধারের যে পথনির্দেশ আমাদেরকে দান করা হয়েছে, তার মর্মকথা হচ্ছে এই যে, বিপ্লবের জন্য একটি শুদ্ধি-আন্দোলন অপরিহার্য, যা শুরু হবে তাওহিদের দাওয়াতকে সামনে রেখে। অতঃপর জাহিলিয়াত তার সর্বশক্তি নিয়ে তাওহিদের এই দাওয়াতের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করবে।

শুরু হবে উভয়ের মধ্যে সংঘাত। মুমিনরা ধৈর্য্যধারণ করবে। অতঃপর এমন দিন আসবে, মুমিনের দল তাদের রব্বের ইচ্ছায় বজ্রের ন্যায় অগ্রসর হয়ে, উম্মাহর শক্তি ও কল্যাণকে বিস্ফোরিত করবে। জনসাধারণ তাদের পক্ষ নেবে এবং লোহা ভক্ষণকারী ঈমানদাররা এ জলন্ত চুলায় (ময়দানে) ত্যাগ দিতে থাকবে এবং সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।

এ সংঘাতের প্রধান উপকরণ ইসলামি আন্দোলনের বীর সৈনিকেরা। মাঝপথে দুর্বল ও কাপুরুষেরা ঝরে পড়তে থাকবে আর দৃঢ়পদরা পথ চলা অব্যাহত রাখবে। দীর্ঘ সংগ্রামের পর লড়াইয়ের উত্তাপে আত্মাগুলো পরিশুদ্ধ হবে এবং হৃদয়গুলো পরিচ্ছন্ন ও চকচকে হবে।

আল্লাহ্ তাদেরকে তাঁর সম্মানের আচ্ছাদন বানাবেন, তাদের বিজয়ের ফলগুলোকে হেফাজত করবেন, তাদেরকে তার দ্বীনের বিশ্বস্ত সংরক্ষক বানাবেন এবং তাদেরকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দান করবেন।”

শায়খ আবু বকর বলেন,

“যখন থেকে মুসলিম জাতির উপর হেদায়েতের সূর্য উদিত হয়েছে তখন থেকেই তাদের উপর ধারাবাহিক নানান পরীক্ষা ও মসিবত আপতিত হয়েছে। মানুষকে বিভিন্ন ধরনের ফিতনা ও পরীক্ষার মোকাবেলা করতে হয়। অনেক সময় মানুষের জীবনে সবচেয়ে কঠিন সময়গুলো আসে, ইসলামের হেদায়েত পাওয়ার আগে। তবে

ঈমানের প্রফুল্লতা অন্তরে মেশার পর পরীক্ষা আর ফিতনা ব্যক্তির অন্তরে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক অনুভূতি তৈরি করে। বিয়ের ফিতনা, সম্পদের ফিতনা, চাকরি কিংবা রোজগারের ফিতনা, নানান ধরনের ফিতনার মুখোমুখি তাকে হতে হয়। কিন্তু ঈমানদার যখনই সফলতার সাথে কোন ফিতনার মোকাবেলা করে, তখন সেই ফিতনার মাত্রা অনুযায়ী অন্তরে তাঁর অন্তরে একটি সাদা ফোঁটা পড়ে। অর্থাৎ তার অন্তরে গুনাহর কারণে যে কালো দাগ পড়েছিল তা দূর হয়। পাশাপাশি তাঁর ঈমানও উন্নতির দিকে উঠতে থাকে।

সাহাবীদের প্রজন্মের ঈমান শুরু থেকেই শক্ত ছিল, ব্যাপক ছিল। তারা শুরু থেকেই বিভিন্ন পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছিলেন। এসব পরীক্ষার সামনে তাদের অবিচলতা আর দৃঢ়তার ফলে তাদের ইমানের স্তর আরো উঁচু হয়েছিল। ইমান আরো মজবুত আরো শক্তিশালী হয়েছিল। কিন্তু দুঃখজনকভাবে আজকের অনেক মাশায়েখ এবং উস্তাদরা আমাদের দুঃখদুর্দশা বয়ে আনতে পারে এমন সব কাজ এড়িয়ে যাবার শিক্ষা দেন।

এভাবে আমরা অবনতি ও অধঃপতনের যাত্রা শুরু করি। আমাদের ঈমানী হালতের উন্নতি হয় না, অবনতি হয়। আমাদের ঈমান মজবুত হয় না, বরং যা ছিল তা আরো দুর্বল হয়।

একইভাবে আমরা দেখি যে, প্রথম প্রজন্মের মধ্য থেকে যারা মক্কাতে হেদায়েতের আলোতে আলোকিত হয়েছিলেন তাঁদের কুফরী শক্তির কর্তৃত্বের ফিতনা মোকাবেলা করতে হয়েছিল। আর যারা মদীনায় হেদায়েত পেয়েছিলেন তাঁদের জিহাদের এবং তরবারির ঝনঝনানির মোকাবেলা করতে হয়েছিল।

(তাই হকপন্থীদের কাফেলা) বাতিলের সামনে বলিষ্ঠভাবে হক তুলে ধরে, বস্তুগত ও আত্মিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে, আনসার সংগ্রহ করে (তথা প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা গ্রহণ করে); কিন্তু স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব ও কারাগারকে বরণ করে নেয় না। তবে বন্দিত্ব ও পরীক্ষা এসে গেলে ধৈর্যধারণ করে এবং এটাকে শিক্ষা হিসাবে গ্রহণ করে।

বিপরীতে আরেক দল রয়েছে, যারা এ ব্যাপারে বেশ শিথিলতা করে থাকে। বিপদের আশংকা আছে এমন সব কাজ থেকে তারা দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করে। যেমন বাতিলের সামনে স্পষ্ট হক বলা অথবা বাহ্যিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা থেকে তারা বিরত থাকে। কিন্তু কোনো কাজ না করলেও গর্বভরে চিৎকার বলাবলি করে, আমরা এখন মাক্কী জীবনে আছি। আমরা সবরের পর্যায়ে আছি। আমি জানি না, মাক্কী জীবনের কোন বিধান তারা পালন করছে। তাদের অবস্থান হল নিফাক, কুফরের সাথে মিশ্রন, সহাবস্থান এবং প্রতারণার।”

অর্থাৎ, আদর্শের প্রভাব বিস্তার ও বিজয়ের ক্ষেত্রে বাতিলের সাথে সংঘাত অনিবার্য। এই কঠিন দায়িত্ব আদায়ে উম্মতের মাঝে প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব ও জামাত আবশ্যক যারা দ্বীনকে প্রবল করবেন, মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে আল্লাহর দাসত্বের দিকে নিয়ে আসবেন। আর সাহাবাওয়ালা এমন নেতৃত্ব ও জামাত, যা গড়ে ওঠে কেবল হক আঁকড়ে ধরার কারণে উদ্ভুত কঠিন পরিস্থিতিতেই। আরামদায়ক আলস্য ও বিলাসী জীবনযাত্রার মাঝে সময় অতিবাহিতকারীদের মধ্য থেকে এমন নেতৃত্ব ও জামাত উঠে আসে না।

সুতরাং, নববি মানহাজের আলোকে তাওহিদ প্রতিষ্ঠার জন্য উপযোগী নেতৃত্ব ও আন্দোলনের জন্য সুসাব্যস্ত মূলনীতি হচ্ছে,

ক) সঠিক মানহাজের আলোকে সুপরিকল্পিত ও সুসংগঠিত মেহনত,

খ) এর ফলে আগত পরীক্ষা ও বিপদ সত্ত্বেও অবিচল ও সুদৃঢ় থাকা এবং

গ) প্রতিকূলতার মাঝেও আন্দোলনকে ব্যাপক ও বিস্তৃত করা।

এ উদ্দেশ্যে নবিজি (সা.) ও মুহাজির সাহাবাদের মানহাজই হবে অনুসৃত।

আর সেই মানহাজ হচ্ছে, কুফরের ইমামদের (আমাদের সমাজে কুফরের ইমাম হচ্ছে, সেক্যুলার শাসনব্যবস্থা, বুদ্ধিজীবি ও কালচারাল এলিটদের ত্রিমুখী শয়তানী অক্ষ) শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে জাতির মাঝে বলিষ্ঠ সাংগঠনিক মেহনত। হকের অগ্রগতি

ঠেকাতে কুফরি শক্তির আগত আঘাত সত্ত্বেও ইস্তিকামাত থাকা এবং ইহতিসাব তথা সাওয়াবের আশা রাখা আরো উদ্যমী হয়ে জাতির মাঝে মেরুকরণে আরো জোরদার মেহনত জারি রাখা।

এই তিনটি বিষয় হবে শক্তিশালী, সুসংগঠিত ও ধারাবাহিক বিপ্লবী কর্মসূচীতে অংশ নেয়া প্রত্যেক নেতা ও অনুসারীর মেহনতের ভিত্তি!

فَاصۡدَعۡ بِمَا تُؤۡمَرُ وَ اَعۡرِضۡ عَنِ الۡمُشۡرِكِيۡنَ

"অতএব আপনি যে বিষয়ে আদেশপ্রাপ্ত হয়েছেন তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন এবং মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।" (সূরা আল-হিজর, ১৫:৯৪)

اِنَّا كَفَيۡنٰكَ الۡمُسۡتَهۡزِءِيۡنَ

"নিশ্চয় আমরা বিদ্রুপকারীদের বিরুদ্ধে আপনার জন্য যথেষ্ট।" (সূরা আল-হিজর, ১৫:৯৫)

وَ لَقَدۡ نَعۡلَمُ اَنَّكَ يَضِيۡقُ صَدۡرُكَ بِمَا يَقُوۡلُوۡنَ

"আর অবশ্যই আমরা জানি, তারা যা বলে তাতে আপনার অন্তর সংকুচিত হয়;" (সূরা আল-হিজর, ১৫:৯৭)

فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَ كُنۡ مِّنَ السّٰجِدِيۡنَ

"কাজেই আপনি আপনার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং আপনি সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হোন;" (সূরা আল-হিজর, ১৫:৯৮)

وَ اعۡبُدۡ رَبَّكَ حَتّٰى يَاۡتِيَكَ الۡيَقِيۡنُ

"আর মৃত্যু আসা পর্যন্ত আপনি আপনার রবের ইবাদাত করুন।" (সূরা আল-হিজর, ১৫:৯৯)

অতএব, ইসলামি বিপ্লব সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় যোগ্য নেতৃত্ব ও জামাত প্রাথমিকভাবে অগ্রসর হবে, জাতির মাঝে তাওহিদের দাওয়াহ প্রবল করার মাধ্যমে মেরুকরণে ভুমিকা রাখার দ্বারা। নবি (সা.) এর মুহাজির সাহাবারা যেভাবে সুসংগঠিত ও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর আলোকে মেহনত করেছিলেন, তার আলোকে।

অর্থাৎ, সমাজে তাওহিদ ও কুফরের (সেক্যুলারিজম) মেরুকরণের ফলে উভয় পক্ষের শক্তির ভারসাম্য কমে আসবে। আর এক্ষেত্রে বাতিল শক্তির আঘাত তো অনিবার্যই, কারণ দাওয়াহ ও দলীলের ময়দানে হককে পরাজিত করা তার সম্ভব না। তাই হক তীব্র হলে, বাতিল তাকে শক্তির মাধ্যমেই দমন করতে চাইবে। তাই দাওয়াহ ও বাতিলের সাথে সংঘাত, এই মূলনীতির আলোকে সুসংগঠিত আন্দোলন ঈমান, আত্মত্যাগ ও অবিচলতাকে আঁকড়ে ধরে, আল্লাহর ইচ্ছায়—এমন আসবাব গ্রহণ করবে; যা উপযোগী পরিস্থিতিতে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দিয়ে বিপ্লব সম্পাদনে সক্ষম হবে।

তাই, এখন বিপ্লবের উপযোগী পরিস্থিতির অর্জনের আগ অবধি, সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনামাফিক (فَاصۡدَعۡ بِمَا تُؤۡمَرُ وَ اَعۡرِضۡ عَنِ الۡمُشۡرِكِيۡنَ) মূলনীতির আলোকে হক ও বাতিলের মেরুকরণ স্পষ্ট করে দেয়ার ধারাবাহিক ও সুসংগঠিত মেহনত চালিয়ে যাওয়াই হবে নবিগণের মানহাজের অধিক নিকটবর্তী! আল্লাহই ভালো জানেন।

এ উদ্দেশ্যেই সমাজ ও রাষ্ট্রে তাওহিদের কর্তৃত্ব ফিরিয়ে আনার কাজ শুরু করা হয় দাওয়াহ ও সংগঠনের মাধ্যম। কেননা, বিপ্লবের জন্য অপরিহার্য হলো—আদর্শিক ভিত্তি, সামরিক ও ঈমানী প্রস্তুতির পাশাপাশি উপযোগী পরিস্থিতি তৈরী ও তাকে কাজে লাগানোর সক্ষমতা।

আফসোসের বিষয় হলো, সাধারণ এক দল তো উপযোগী পরিস্থিতি না থাকার অজুহাত দিয়ে গণতন্ত্র, ব্যালট বাক্স আর আত্মকেন্দ্রিক

চিন্তায় মগ্ন হয়ে সামাজিক শক্তি অর্জনের চিন্তা বাদ দিয়েছে। আবার আরেক দল উপযোগী পরিস্থিতি আনয়নের মেহনত বাদ দিয়ে স্রেফ বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারা, সামরিক প্রস্তুতি বা শক্তি অর্জনের ভাসাভাসা মেহনতকেই যথেষ্ট মনে করেছে। কিন্ত বাস্তবতা হলো, শক্তি বলতে কেবল গোলাবারুদ আর মানুষের জমায়েত বোঝায় না। শক্তি বলতে প্রশিক্ষণের মতো বিমূর্ত বিষয় যেমন বোঝায়; একইভাবে উপযোগী পরিস্থিতি ও মুহাজিরিনদের জামাতের ন্যায় আদর্শের উপর দীক্ষালাভকে আরো বেশী বোঝায়; যা সমকালীন জামাতগুলো উপেক্ষা করেছে। অথচ, আল্লাহর রাসুল (সা.) ও রব্বানী ব্যক্তিবর্গ শারঈ ও সার্বজনীন সূত্র অনুযায়ী পরিস্থিতির আলোকে শক্তি অর্জন করেই শত্রুর উপর বিজয়ী হয়েছেন।

তারা ভুলে গেছেন বা ইমামদের মানহাজকে উপেক্ষা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নি যে, শক্তি সঞ্চয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হচ্ছে—বিপ্লবের উপযোগী পরিস্থিতি প্রস্তুতকরণ এবং বিশুদ্ধ ফিকর, ঈমানী সংহতি ও কঠিন মেহনতের মাধ্যমে গড়ে ওঠা যোগ্য নেতৃত্ব ও জামাত; যারা যে কোনো পরিস্থিতি ও উপকরণ নিজেদের অনুকূলে পাওয়ামাত্র যথাযথ আনুগত্য ও কুরবানীর মাধ্যমে বিজয় অর্জনে সক্ষম।

[৪]

নব্বই দশক থেকে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন ভূমিতে যেসব শক্তিশালী ইসলামি আন্দোলন দাড়িয়েছে সেগুলোর দিকে মনোযোগের সাথে তাকালে আমরা দেখতে পাই গণতন্ত্র, পশ্চিমা বিশ্বের সাথে লিঁয়াজো কিংবা বৈশ্বিক কুফুরী গোষ্ঠীর বেঁধে দেওয়া নিয়ম-কানুন ও রাজনৈতিক প্রলোভনসহ বহুবিধ চাকচিক্যময় আহ্বানকে উপেক্ষা করে অগ্রসর হওয়া বিপ্লবী জামাতগুলো সর্বপ্রকার মুসিবত ও বাধাবিপত্তির বেড়াজাল ছিন্ন করতে পেরেছে আলহামদুলিল্লাহ।

হত্যা, বন্দীত্ব, ড্রোন হামলা কিংবা অর্থনৈতিক অবরোধ সত্ত্বেও বিগত শতাব্দী থেকে নিয়ে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী ও প্রভাব বিস্তারকারী ইসলামি আন্দোলন আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইয়েমেন, সোমালিয়া, মালি বা শামে নিজেদের দাওয়াতের কল্যাণ ও যথার্থতা প্রমাণ করেছে। যে আন্দোলনের ভিত্তিপ্রস্তর ছিল সময়ের ইমামদের নববি মানহাজ। তারা কোনো নতুন পথ আবিষ্কার করেননি। বরং দিগভ্রান্ত ও প্রতারিত উম্মাহকে পূর্ববর্তী নেককার ইমামদের দেখানো মূলনীতির উপর ভিত্তি করে সঠিক সমরকৌশল ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সম্মান ও গৌরবের পথে ফিরিয়ে এনেছেন। যখনই এই মানহাজ পরিত্যাগ করা হয়েছে; জামাত বা আন্দোলন মুখ থুবড়ে পরেছে। যেমনটা আমরা কিছুটা দেখেছি ইরাক ও শামে।

বিগত শতাব্দীর শুরুতে জমিনের বুক থেকে তাওহিদের কর্তৃত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে অপসারিত হওয়ার পর থেকে, তামকিন ফিরিয়ে আনার প্রায়োগিক মেহনত ও আন্দোলন মূলত দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে আছেঃ-

1) ইখওয়ানি বা গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা

2) বিপ্লবী-জিহাদি চিন্তাধারা,

ইসলামি আন্দোলনগুলো গণতান্ত্রিক মানহাজের প্রবেশের পর থেকে মোটা দাগে ইখওয়ানি, দেওবন্দি, আজহারি, সালাফি ইত্যাদি মাসলাকের গণতান্ত্রিক মানহাজের মাঝে শাখাগত কিছু মতপার্থক্য থাকলেও, বাস্তব ময়দানে এই চিন্তাধারা ও রাজনৈতিক মেহনতের মূল তাত্ত্বিক ঘুরেফিরে কয়েকজনই; যেমন—উস্তাদ হাসানুল বান্না, মাওলানা আবুল আলা মওদুদি, হাসান হুদাইফি, রশিদ ঘানুশি, ইউসুফ কারদাবি প্রমুখ। এই মানহাজের বর্তমান অনুসারীরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই ব্যক্তিদের দেয়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই সাধারণত নিয়ে আসেন।

আর নববি মানহাজের পথিকৃৎদের নাম আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, উস্তাদ সাইদ কুতুব, শায়খ আবদুল্লাহ আজ্জাম, শায়খ উসামা, শায়খ আইমান, শায়খ আবু মুসআব, শায়খ আবু বাকর, শায়খ আবু কাতাদা ও শায়খ মাকদিসি।

তাওহিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসেবে মুসলিমদের ভূমিতে শরীয়াহর কর্তৃত্ব ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ইমামগণ রাজনৈতিক কৌশল

সাজিয়েছেন দুই ধাপেঃ-

1) প্রথম ধাপে আফগানিস্তান, সোমালিয়া, মালি, ইয়েমেন, পাকিস্তানের গোত্রীয় অঞ্চলের মতো বিপ্লবের উপযোগী ভূমিগুলো দীর্ঘমেয়াদী সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন করা এবং আমেরিকা, ফ্রান্সের মতো পরাশক্তিকে নিজ খোলসে ফিরিয়ে দেয়া। যেন আমেরিকা বা অন্য কোনো পরাশক্তি মুসলিম ভূমিগুলোতে হস্তক্ষেপের চিন্তাও না করে।

2) দ্বিতীয় ধাপে মিশর, তিউনিশিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ বা সিরিয়ার মতো শক্তিশালী ও বিস্তৃত কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন সমতল ভূমির দেশ। যেগুলো মুক্ত করে নেয়া হবে পরাশক্তির প্রভাব নষ্ট হওয়ার পর।

ইমামদের চিন্তা ছিল, পরাশক্তির পতনের এসব অঞ্চলের ইসলামি আন্দোলনগুলো পর নিজেদের স্বাধীন করে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করে নিবে। যেভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপীয়রা দুর্বল হয়ে পড়ায় উপনিবেশগুলোর জাতীয়তাবাদী নেতারা নিজেদের ভূমিকে 'মুক্ত' করে নিয়েছিল। এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর, পূর্ব ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ার দেশগুলো নিজেদের মুক্ত করেছিল।

কিন্তু আফসোস হলো এধরণের ভূমিগুলোতে রাজনৈতিকভাবে মুসলিমরা উচ্চাকাঙ্খী বা প্রস্তুত কোনোটাই ছিল না। যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তাও সরলমনা, অপ্রস্তুত ইসলামপন্থীরা হারিয়েছে সুবিধাবাদী সেক্যুলারদের কাছে। আবার, সামর্থ্য ও সুযোগের অভাবে এজাতীয় দেশগুলোতে নববি মানহাজের আলোকে আন্দোলন গড়ে ওঠেনি।

প্রথম সারির ভূমিগুলোতে তাওহিদের কর্তৃত্ব ফিরিয়ে আনার বাস্তবতা আলহামদুলিল্লাহ অনেকাংশেই এখন দৃশ্যমান। ফা লিল্লাহিল হামদ। কিন্তু, দ্বিতীয় সারির রাষ্ট্র তথা, অবশিষ্ট সমতল ভূমির দেশ, যেখানে শাসনব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ শক্তিশালী এবং সমাজ সেক্যুলার সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের স্বীকার; সেখানে বহুমুখী আন্দোলন চেষ্টা করা সত্ত্বেও দায়িত্ব অসমাপ্ত রয়ে যায়! অথবা বলা যায়, জিম্মাদারি আদায়ের প্রাথমিক চেষ্টাটিও করা সম্ভব হয়নি।

শায়খদের মানহাজকে উপেক্ষা করে স্থানীয়ভাবে যারা নানামুখী তত্ত্ব ও কর্মসূচী হাজির করছেন, তারা বেমালুম ভুলে যাচ্ছেন যে, তাওহিদের বিপ্লবের জন্য সামরিক শক্তিরও আগে প্রয়োজন সামাজিক শক্তি, যা ব্যতীত দীর্ঘমেয়াদী বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনা কিংবা বিপ্লব সম্পাদন সম্ভব না। আফগানিস্তান, ইয়েমেন, সিরিয়া, সোমালিয়া বা মালিতে ইসলামি আন্দোলনের সফলতার অন্যতম কারণ, সেখানে মুসলিমদের বিদ্যমান থাকা সামাজিক শক্তি। প্রাচীন গোত্রীয় সমাজব্যবস্থা, গৃহযুদ্ধ, শীতল যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সমাজতান্ত্রিক শাসনের অচলাবস্থা ইত্যাদি নানা কারণে এদেশগুলোতে জনসাধারণের মাঝে কেন্দ্রীভূত সেক্যুলার শাসনের প্রভাব হয়ে ছিল অত্যন্ত দুর্বল; যার সুযোগে উম্মতের ইমামরা সঠিক মানহাজের আলোকে দাওয়াহ ও জিহাদের মাধ্যমে বিপ্লব সম্পন্ন করেছেন।

অন্যদিকে আরব বসন্ত পরবর্তী সময়ে বেশ কিছু ভূমিতে একই বাস্তবতা উপস্থিত হলেও, যথাযথ প্রস্তুতি ও সামাজিক শক্তির অনুপস্থিতি মিশর, মরক্কো, তিউনিশিয়া ও লিবিয়াতে তা সফলতা এনে দিতে পারেনি। যদি এসব ভূমিতে আফগানিস্তান, ইয়েমেন বা মালির মতো পূর্ব থেকেই নেতৃত্ব, মানহাজ ও কার্যকর আল্লাহওআলাদের জামাত প্রস্তুত থাকতো তবে এমনটা হতো না।

শায়খ সালাহুদ্দিন জায়দান বলেন,

> "আরব বিপ্লবগুলি উত্তেজনা, দ্রুততা ও স্বতঃস্ফূর্ততার মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল, তবে তাদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব ছিল; তাই এ আন্দোলন সফলতার মুখ দেখেনি। আমরা যেসব সমালোচনাযোগ্য কাজে পতিত হয়েছিলাম তা হলো—
>
> ক) এতদঞ্চলে (অর্থাৎ, পশ্চিম আফ্রিকা, আরবের সমতল ভূমির রাষ্ট্রগুলোতে) আন্দোলনের জোয়ার ও (অন্যান্য) ইসলামি দলগুলোর উপর নির্ভর করা।
>
> খ) পরিবর্তনের জন্য যোগ্য নেতৃত্ব এবং কর্মসূচীর কাঠামোকে সঠিকভাবে ধারণ করতে না পারা।

গ) ইসলামি দলগুলোর কাতারে সেক্যুলারদের জায়গা পাওয়া এবং হঠকারী স্বভাবের লোকজনকে একীভূত করা।

আমরা এই গণজাগরণ এবং এতে অংশ নেয়া জামাতগুলোর মাঝে যথাযথ সমন্বয় সাধন করতে পারিনি। জনগণের সামনে এই আন্দোলনের রুপরেখা সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারিনি। এবং ভবিষ্যৎ আন্দোলনের জন্য জনগণকে যথাযথ উদ্বুদ্ধ করতে পারিনি।

তদ্রূপ আমাদের এপর্যায়ে পৌছানো এবং আমাদের কার্যক্রম নিয়েও এদলগুলোর যথেষ্ট সংশয় ছিলো। তাই তারা হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি। বরং, আমাদের আক্রমণ করে বসেছে, সমালোচনা ও অবজ্ঞা করেছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লার উপর ভরসা করার পর আমাদের জন্য আবশ্যক হলো চতুর্দিকে বিপ্লবী আন্দোলন সুবিন্যস্ত করা। আর জনগণ বর্তমানে যে অবস্থায় আছে, তার থেকে উন্নত অবস্থা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৃষ্টি হয়ে যাবে—এমন পরিস্থিতির জন্য বসে না থাকা।

কেন আমরা সর্বত্র (মিশর, তিউনিশিয়া ইত্যাদি দেশে) ইসলামি আন্দোলনের উপর নির্ভরশীল ছিলাম? কেন ইসলামি রাষ্ট্রগুলোতে আমরা নিজস্ব জামাত তৈরী করতে পারিনি?

এর অনেকগুলো কারণ রয়েছে, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো—সক্ষমতার অভাব।

আমাদের চিন্তাভাবনায় একথা চেপে বসেছিল যে: ইসলামি তেহরিক ও জামাতগুলো সময়ের চাকায় পিষ্ট হয়ে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। তারা তাদের কর্মীদেরকে যথাযথ তরবিয়তের মাধ্যমে যোগ্য করে গড়ে তুলেছে। এই কর্মীরা উম্মতের গুরুদায়িত্ব পালনে সক্ষমতা অর্জন করেছে, এবং আল্লাহর ইচ্ছা বাস্তবায়নে যে কোন সুযোগকে কাজে লাগাতে পরিপক্ক হয়েছে।

এটাই আমাদের বড় একটি ভুল, যা সময়ই প্রমান করে দিয়েছে। আমরা ভুলের মধ্যে ছিলাম। আমরা বাস্তবতাকে ভুলে গিয়েছিলাম। আমরা ভুলে গিয়েছিলাম ঘটনাপ্রবাহ এবং সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লার রীতিনীতিকে।"

(কিছুটা পরিমার্জিত)

গভীরভাবে চিন্তা করলে এ বাস্তবতাও স্বীকার্য যে, পৃথিবীর বিভিন্ন ভূমির ভৌগোলিক ও ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের কারণে কোথাও সঠিক মানহাজের আন্দোলন দ্রুত ও ব্যাপকতার সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আবার কোথাও তা প্রাথমিক পর্যায়েই স্থির হয়ে আছে। উপযোগী প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হওয়া ছাড়া আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া সম্ভব নয়। আর উপযোগী পরিস্থিতিকে কাজে লাগাতে বিপ্লবী সংগঠন, দাওয়াত ও মেহনতের কোন বিকল্প নেই। জাতির মাঝে ব্যাপকভাবে তাওহিদের বিজয়ে বিশ্বাস এবং কুফরের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞার অনুভূতি সঞ্চারণ ব্যতীত জিহাদী আন্দোলন দাঁড়াতে পারে না। ইসলামপন্থীদের বিরোধিতাকারীর তুলনায় সহানুভূতিশীলদের অংশ যদি ভারী না হয়, তাহলে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অধীনস্থ সমতল ভূমিতে ব্যাপক বিপ্লবী কার্যক্রম পরিচালনা কিংবা বিশেষ প্রেক্ষাপট কাজে লাগানো প্রায় অসম্ভবই বটে।

তাই আমাদের দেশের মতো ভূমিতে সুসংগঠিত কার্যক্রমের ব্যাপ্তি ঘটানো অনেক জরুরি। বাস্তবতা হচ্ছে জাতির মাঝে বিশুদ্ধ আকিদা-মানহাজের দাওয়াতের বিস্তৃতি ছাড়া বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়া সম্ভব না। যদি তাওহিদ ও নববি মানহাজের দাওয়াতের ব্যাপকতা না থাকতো, তবে আফগানিস্তান, শাম, ইয়েমেন কিংবা মালিতে বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হতো না কিংবা সফলতার সাথে চলমান থাকতে সক্ষম হতো না। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

তাই, সংগঠনগুলোর পাশাপাশি আলেম, অ্যাক্টিভিস্ট ও দা'ঈদের জন্য আবশ্যক পরিবার থেকে শুরু করে সর্বত্র বিশুদ্ধ আকিদা ও মানহাজের দাওয়াহ সরল ও বলিষ্ঠভাবে প্রচার-প্রসারে সময় ও সামর্থ্যের সর্বোচ্চটুকু ব্যয় করা।

স্মর্তব্য যে, আপামর জনসাধারণের মাঝে বিপ্লবীদের দাওয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছে—তাওহিদ, ইসলামি শাসনব্যবস্থা, আল ওয়ালা ওয়াল বারা'র আকিদার ভিত্তিতে উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করা। এবং এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয়া যে, জাতীয় ও আর্থ-সামাজিক সকল সমস্যার সমাধান ইসলামের শাসন ও বিধান নিশ্চিত করার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। এ উদ্দেশ্যে দেশের প্রতিটি প্রান্তসীমা থেকে নিয়ে সর্বত্র এই দাওয়াহকে প্রবল করা।

এই মেহনতের উদ্দেশ্য জনমানুষকে নবিগণের উদ্দেশ্যের সাথে একাত্ম করা, তথা জমিনে তাওহিদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইনসাফ ফিরিয়ে আনা। জনসাধারণকে কোন নির্দিষ্ট সংগঠনে যোগ দিতে বা সক্রিয় সমর্থন আদায়ে প্রভাবিত করতে হবে, এটা জরুরী না। বরং ব্যক্তিজীবন থেকে নিয়ে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষ যেন আল্লাহর হুকুম জানামাত্র মেনে নেওয়ার মানসিকতা অর্জন করে, আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব উপলব্ধি করে, ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ছেড়ে আখিরাতমুখী হয়ে অল্পে তুষ্টির জীবনে আগ্রহী হয়, সামাজিক রাজনীতির স্থলে শরীয়াহর অনুগমনে অভ্যস্ত হয়। এটাই হবে আমাদের কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।

জীবন ও সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাওহিদের দাবিই হচ্ছে-সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুমের সামনে সকল কিছুকে অবনত, অনুগত করা। বিশেষত, মুসলিম উম্মাহ ও ইসলামের প্রধানতম শত্রু আমেরিকা ইসরায়েলের নেতৃত্বাধীন জায়নবাদী চক্র এবং উপমহাদেশে শিরকের ইমাম ভারত ও তাদের তাবেদার স্থানীয় শাসক গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যাপারেও জাতির সচেতনতা বৃদ্ধিতে জোরদার প্রচেষ্টা জারি রাখতে হবে।

হাকিমুল উম্মাহ্ শায়খ আইমান আল মিসরি বলেন,

> "দাওয়াতী কাজের মাকসাদ হচ্ছে; আগ্রাসী ক্রুসেডার (এবং ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসী প্রশাসন) এর হুমকির বিষয়ে উম্মাহ'কে সচেতন করে তোলা, তাওহিদের সঠিক ব্যাখ্যা তাদের নিকট পরিষ্কার করে দেওয়া যে, বিধান প্রণয়নের এবং সার্বভৌমত্ব কেবল একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই অধিকারভুক্ত। এবং ইসলামভিত্তিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও সকল স্থানের মুসলিমদের ঐক্যের উপর গুরুত্বারোপ করা। আল্লাহ্'র ইচ্ছায় এইটা হবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদ্ধতি অনুসারে খিলাফত প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন। এ পর্যায়ে দাওয়াতী কর্মকাণ্ড দুইটি স্তরে সম্পন্ন হবে, যার একটি হচ্ছে-জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা, তাদেরকে উৎসাহিত করা এবং তাদেরকে এর উপর ঐক্যবদ্ধ করার জন্য কঠিন চেষ্টা করা যেন তারা শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধাচারণ করে ইসলামের পক্ষাবলম্বন করে এবং ইসলামের জন্য কাজ করে।"

সুতরাং, দাওয়াতি ও তরবিয়তি মেহনত চলবে প্রথমত জাতির উত্তম অংশটির মাঝে, যেন বিপ্লবের নেতৃত্ব দানকারী সংগঠন তার উপযোগী লোক পেয়ে যায় এবং বিশুদ্ধ আন্দোলনের ধারা জারি রাখা সম্ভব হয়। এছাড়াও, জাতির মাঝে সুসংগঠিত দাওয়াতি ও তরবিয়তি মেহনত জারি রাখা প্রয়োজন হবে, যেন উপযোগী পরিস্থিতি ও উপকরণ সাপেক্ষে বিপ্লবী সংগঠনের নেতৃত্বে জাতি ইসলামি বিপ্লবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে।

যারা কেবল সামরিক শক্তির পেছনে সময় দেয়ার মতো অপরিণামদর্শী মানহাজ আঁকড়ে ধরেছে; তাদেরকে বলা হবে, সামরিক শক্তি কেবল অন্যান্য শক্তিকে পূর্ণতা দিয়ে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের পথ সুগম করে। অপূর্ণাঙ্গ মানহাজের আলোকে পথ চলে, নিজেদের সমাজে অপ্রাসঙ্গিক করে এবং স্থবিরতার শিকার হওয়ার ফলাফল জানার জন্য বিগত ত্রিশ বছরের ইসলামি সামরিক আন্দোনগুলোর ব্যর্থতার ইতিহাস অধ্যায়নই যথেষ্ট হবে।

আর যারা সব ধরণের সংঘাতের রাস্তা এড়িয়ে নরম, গৎবাঁধা ও আরামদায়ক মানহাজ আঁকড়ে ধরেছেন, তাদের জেনে রাখা উচিৎ—সংঘর্ষ অনিবার্য।

যদি সংঘর্ষের আগেই শুধু দাওয়াহ ও ইদাদের মাধ্যমে, তামকিন (কর্তৃত্ব) অর্জন হয়, তাহলে পরবর্তীতে দীর্ঘ ও তীব্র সংঘর্ষের প্রয়োজন হয়। যেমন—মদীনায় প্রয়োজন ছিল। আর যদি তীব্র সংঘর্ষের পর তামকিন আসে, সেক্ষেত্রে পরবর্তীতে শুধুমাত্র দাওয়াহ ও ইদাদ চলমান থাকাই যথেষ্ট হয়। যেমন—আফগানিস্তান।

তাই, ইসলামি শাসনব্যবস্থা অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ মারহালা হিসেবে ইসলামি আন্দোলনের উচিৎ এক আল্লাহর দাসত্বের অপরিহার্যতার ভিত্তিতে সমাজে মেরুকরণ সৃষ্টিতে গুরুত্ব দেয়া। যেন সেক্যুলার কুফরি শাসনের অধীন থেকে মুসলিমদের অন্তত ঐ পরিমাণ অংশ তাওহিদের পতাকাতলে চলে আসে, আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনে যাদের কেন্দ্রীয় ভূমিকা রাখার সক্ষমতা রয়েছে। এজন্য অবশ্যই ইসলামি আন্দোলনকে উপযোগী পরিস্থিতিতে সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রতিবিধান, এমনকি প্রয়োজনে তীব্র ও সরাসরি সংঘাতের জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে। এই দুই স্তরেই নবিগণের উত্তরসূরীদের আত্মত্যাগ ও সুউচ্চ হিম্মতের পাশাপাশি ঈমানী সংহতি ও ফিকরি পরিকপক্কতার প্রয়োজন পড়বে।

উস্তাদ আবুল আলা মওদুদির অনেক বিষয়ের সাথে একমত হবার সুযোগ নেই তা অনেকের কাছেই স্পষ্ট। তবে উনার কিছু আলোচনা থেকে দিকনির্দেশনা লাভেরও প্রয়োজন রয়েছে। আধুনিক সেক্যুলার জাতিরাষ্ট্র ও ইসলামি রাষ্ট্র সংক্রান্ত কিছু সুন্দর, জরুরী আলোচনা তিনি করেছেন। যেহেতু বাংলাদেশ বর্তমানে একটি সেক্যুলার জাতিরাষ্ট্র (nation-state), আর আমরা চাচ্ছি এই রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বিলোপ করে ইসলামের শাসন ফিরিয়ে আনতে। তাই উস্তাদ মওদুদির বক্তব্য থেকে আধুনিক সেক্যুলার রাষ্ট্র ও ইসলামি শাসনব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা সম্পর্কে ধারণা পেতে উস্তাদ মওদুদি (রহ.)'র বক্তব্য তুলে ধরছি—

> আমরা যে রাষ্ট্রকে 'ইসলামি রাষ্ট্র' বলে আখ্যায়িত করেছি, তার প্রকৃত রূপটা কি? কি তার প্রকৃতি? কি তার ধরণ? কি তার বৈশিষ্ট্য ও আসল পরিচয়? – তা আমাদের ভালোভাবে বুঝে নেয়া দরকার। ইসলামি রাষ্ট্রের সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট্য হলো, জাতীয়তাবাদের নাম গন্ধও এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এ জিনিসটিই ইসলামি রাষ্ট্রকে অন্য সব ধরণের রাষ্ট্র থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। এ হচ্ছে নিছক একটি আদর্শিক রাষ্ট্র। এ ধরণের রাষ্ট্রকে আমি ইংরেজীতে 'Ideological State' বলবো। এমন আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্রের সাথে মানুষ সব সময় পরিচিত ছিল না। আজও পৃথিবীতে এ ধরণের কোন আদর্শিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত নেই। প্রাচীনকালে মানুষ বংশীয় বা শ্রেণীগত রাষ্ট্রের সাথে পরিচিত ছিলো। অতপর গোত্রীয় এবং জাতীয় রাষ্ট্রের সাথে পরিচিত হয়। এমন একটি আদর্শিক রাষ্ট্রের কথা মানুষ তার সংকীর্ণ মানসিকতায় কখনো স্থান দেয়নি, যার আদর্শ গ্রহণ করে নিলে বংশ, গোত্র, জাতি ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশীদার হয়ে যাবে।
>
> খৃষ্টবাদ এর একটি অস্পষ্ট নকশা লাভ করেছিল। কিন্তু সেই পূর্ণাঙ্গ চিন্তা কাঠামো তারা লাভ করেনি, যার ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ফরাসী বিপ্লবে আদর্শিক রাষ্ট্রের একটি ক্ষীণ রশ্মি মানুষ প্রত্যক্ষ করেছিল বটে, কিন্তু তা অচিরেই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের অন্ধ গহবরে তলিয়ে যায়। কমিউনিজম আদর্শিক রাষ্ট্রের ধারণা বিশেষভাবে প্রচার করে। এমনকি এ মতবাদের ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্রের বুনিয়াদ স্থাপনেরও কোশেশ করে। এর ফলে বিশ্ববাসীর মনে আদর্শিক রাষ্ট্রের ক্ষীণ ধারণাও জন্ম নিতে থাকে। কিন্তু অবশেষে এর ধমনীতেও ঢুকে পড়লো জাতীয়তাবাদের যাবতীয় তীর্যক ভাবধারা। জাতীয়তাবাদ কমিউনিজমের আদর্শিক ধারণাকে ভাসিয়ে নিয়ে ডুবিয়ে দিলো সমুদ্রের তলদেশে।
>
> পৃথিবীর প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত একমাত্র ইসলামই হচ্ছে একমাত্র সেই আদর্শ নীতি, যা জাতীয়তাবাদের যাবতীয় সংকীর্ণ ভাবধারা থেকে মুক্ত করে রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে নিরেট আদর্শিক বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। আর একমাত্র ইসলামই হচ্ছে সেই মহান আদর্শ, যা গোটা মানব জাতিকে তার এই আদর্শ গ্রহণ করে অজাতীয়তাবাদী বিশ্বজনীন রাষ্ট্র গঠনের আহ্বান জানায়।
>
> বর্তমান বিশ্বে যেহেতু এমন একটি রাষ্ট্রের ধারণা অপরিচিত এবং যেহেতু বিশ্বের সবগুলো রাষ্ট্র ব্যবস্থার অবস্থা এ ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত, তাই কেবল অমুসলিমরাই নয়, স্বয়ং মুসলমানরা পর্যন্ত এমন একটি রাষ্ট্র এবং এর অন্তর্নিহিত ভাবধারা (implications) অনুধাবন করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। যারা মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়েছে বটে, কিন্তু সমাজ ব্যবস্থার ধারণা গ্রহণ করেছে পুরোপুরিভাবে ইউরোপীয় ইতিহাস, রাজনীতি, ও সমাজ বিজ্ঞান (Social science) থেকে, তাদের মন মস্তিষ্কে এ ধরণের আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্রের ধারণা কিছুতেই স্থান পায় না। উপমহাদেশের বাইরেও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ যেসব দেশ স্বাধীন হয়েছে, সেসব দেশেও এ ধরণের লোকদের হাতেই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব এসেছে। জাতীয় রাষ্ট্র (National State) ছাড়া আর কোনো ধরণের রাষ্ট্রের

কথা কল্পনাও করতে পারেনা। কারণ, তাদের মনমস্তিষ্ক তো ইসলামের জ্ঞান, চেতনা এবং আদর্শিক রাষ্ট্রের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এই উপমহাদেশেও যারা সে ধরণের শিক্ষা দীক্ষা লাভ করেছে, তারাও এ জটিল সমস্যায় জর্জরিত।

ইসলামি রাষ্ট্রের নাম মুখে এরা উচ্চারণ করে বটে, কিন্তু যে শিক্ষা দীক্ষায় বেচারাদের মস্তিষ্ক গঠিত হয়েছে, তা থেকে ঘুরে ফিরে কেবল সেই 'জাতীয় রাষ্ট্রের' চিত্রই বারবার তাদের সামনে ভেসে উঠে। জ্ঞানত কিংবা অজ্ঞতাবশতঃ এরা কেবল জাতি পূজার (Nationalistic Ideology) বেড়াজালেই ফেঁসে যায়। তারা যে পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর কথাই চিন্তা করুক না কেন, তা করে থাকে জাতীয়তাবাদেরই ভাবধারার ভিত্তিতে। ইসলামি রাষ্ট্র সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ গতানুগতিক ধারণা পোষণ করে।

তারা মনে করে, 'মুসলমান' নামের যে 'জাতিটি' রয়েছে, তার হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কিংবা অন্তত রাজনৈতিক নেতৃত্ব এলেই তা ইসলামি রাষ্ট্র হবে। আর এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে তারা যতোই চিন্তাভাবনা করে, অন্যান্য জাতির অবলম্বিত কর্মপন্থা ছাড়া নিজেদের সেই জাতিটির জন্যে অন্য কোন কর্মপন্থাই তাদের নজরে পড়েনা। এই ধারণাই তাদের মগজকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, পৃথিবীর অন্যান্য জাতি যেসব উপায় উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে, তারাও ওসব উপায় উপাদানের সমন্বয়েই তাদের জাতিটিকে গঠন করবে। তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত করে দেয়া হবে। তাদের মধ্যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সৃষ্টি করা হবে। জাতীয় গার্ডবাহিনী সংগঠিত করা হবে। গঠন করা হবে জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী। যেখানে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে, সেখানে গণতন্ত্রের স্বীকৃত নীতি 'সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন' (Majority Rule) এর ভিত্তিতে তাদের জাতীয় রাষ্ট্র সংগঠিত হবে। আর যেখানে তারা সংখ্যালঘু, সেখানে তাদের 'অধিকার' সংরক্ষিত হবে।

তারা মনে করে, তাদের স্বাতন্ত্র্য ঠিক সেভাবে সংরক্ষিত হওয়া উচিত, যেভাবে বিশ্বের অন্যান্য দেশে প্রতিটি সংখ্যালঘু জাতি (National Minority) নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে চায়। তারা চায়, শিক্ষা, চাকুরী এবং নির্বাচনী সংস্থাসমূহে নিজেদের কোটা নির্ধারিত হবে। নিজেদের প্রতিনিধি নিজেরা নির্বাচন করবে। ইত্যাদি ইত্যাদি জাতীয়তাবাদী চিন্তা তাদের চিন্তাশক্তিকে গ্রাস করে রেখেছে। এসব জাতীয়তাবাদী চিন্তা প্রকাশ করার সময় তারা উম্মাহ্, জামায়াত, মিল্লাত, আমীর, ইতায়াত প্রভৃতি ইসলামি পরিভাষাই মুখে উচ্চারণ করে। কিন্তু এই শব্দগুলো তাদের কাছে জাতীয় ধর্মবাদের জন্যে ব্যবহৃত শব্দাবলীরই সমার্থক। সৌভাগ্যবশতঃ তারা এ শব্দগুলো পুরানো ভান্ডারে তৈরি করাই পেয়ে গেছে এবং এগুলো দিয়ে তাম্র মুদ্রার উপর স্বর্ণমুদ্রার মোহরাংকিত করার সুবিধে পাচ্ছে।

আপনারা যদি আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্রের সঠিক পরিচয় উপলব্ধি করে নিতে পারেন, তাহলে একথাটি বুঝতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হবে না যে, এ ধরণের জাতীয়তাবাদী চিন্তাপদ্ধতি, কার্যসূচি তো দূরের কথা, বরঞ্চ এ মহান কাজের সূচনাই হতে পারেনা। সত্য কথা বলতে কি, জাতীয়তাবাদের প্রতিটি অঙ্গ একেকটি তীক্ষ্মধার কুঠারের মতো, যা আদর্শিক রাষ্ট্রের মূলে কুঠারাঘাত করে, তাকে বিনাশ করে দেয়।

আদর্শবাদী রাষ্ট্র যে ধারণা (idea) পেশ করে, তার মূল কথাই হচ্ছে, আমাদের সামনে 'জাতি' বা 'জাতীয়তাবাদের' কোনো অস্তিত্ব নেই। আমাদের সামনে রয়েছে শুধু মানুষ বা মানব জাতি। তাদের কাছে আমরা এক মহান আদর্শ এ উদ্দেশ্যে পেশ ও প্রচার করবো যে, এ আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত হবার মধ্যেই তাদের সকলের কল্যাণ ও সাফল্য নিহিত রয়েছে। এই আদর্শ গ্রহণকারী সকল মানুষ ঐ আদর্শিক রাষ্ট্রটি পরিচালনায় সমান অংশীদার।

এবার একটু চিন্তা করে দেখুন, যে ব্যক্তির মন মগজ, ভাষা বক্তব্য, কাজ কর্ম, তৎপরতা প্রভৃতি প্রতিটি জিনিসের উপর সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও জাতিপূজার মোহরাংকিত হয়ে আছে, সে কী করে এই মহান বিশ্বজনীন আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চলতে সক্ষম হবে? সংকীর্ণ জাতি পূজায় অন্ধ বিভোর হয়ে সে নিজের হাতেই তো বিশ্বমানবতাকে আহ্বান জানাবার পথ বন্ধ করে দিয়েছে। প্রথম কদমেই তো সে নিজের পজিশনকে ভ্রান্তির বেড়াজালে নিমজ্জিত

করেছে। বিশ্বের যেসব জাতি জাতীয়তাবাদী বিদ্বেষে অন্ধ হয়ে আছে, জাতিপূজা এবং জাতীয় রাষ্ট্রই যাদের সমস্ত ঝগড়া লড়াইয়ের মূল কারণ, তাদের পক্ষে বিশ্ব মানবতাকে কল্যাণের আদর্শের প্রতি আহ্বান করা সম্ভব নয়। যারা নিজেদের জাতীয় রাষ্ট্র এবং নিজ জাতির অধিকারের জন্যে ঝগড়ায় নিমজ্জিত, তারা কি বিশ্ব মানবতার কল্যাণের কথা চিন্তা করতে পারে? লোকদেরকে মামলাবাজী থেকে ফিরানোর আন্দোলন আদালতে মামলা দায়ের করার মাধ্যমে আরম্ভ করা কি যুক্তিসংগত কাজ হতে পারে?

ইসলামি রাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, তার গোটা অট্টালিকা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। এ ধারণার মূল কথা হলো, বিশ্ব সাম্রাজ্য আল্লাহর। তিনিই এ বিশ্বের সার্বভৌম শাসক। কোনো ব্যক্তি, বংশ, শ্রেণী, জাতি, এমনকি গোটা মানবজাতিরও সার্বভৌমত্বের (Sovereignty) বিন্দুমাত্র অধিকার নেই। আইন প্রণয়ন এবং নির্দেশ দানের অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট।

এই রাষ্ট্রের প্রকৃত স্বরূপ হচ্ছে, এখানে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবে। আর এ প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা মানুষ সঠিকভাবে লাভ করতে পারে মাত্র দুটি পন্থায়। হয়তো আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি কোনো মানুষের নিকট আইন ও রাষ্ট্রীয় বিধান অবতীর্ণ হবে এবং তিনি তা অনুসরণ ও কার্যকর করবেন। কিংবা মানুষ সেই ব্যক্তির অনুসরণ ও অনুবর্তন করবে, যার নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আইন ও বিধান অবতীর্ণ হয়েছে।

এই শাসন পরিচালনার কাজে এমন সব লোকই অংশীদার হবে, যারা এই আইন ও বিধানের প্রতি ঈমান আনবে এবং তা অনুসরণ ও কার্যকর করার জন্যে প্রস্তুত থাকবে। তাদেরকে এরূপ স্থায়ী অনুভূতির সাথে এ মহান কাজ পরিচালনা করতে হবে যে, সামষ্টিকভাবে আমাদের সকলকে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমাদের প্রত্যেককে এর জন্যে সেই মহান আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে জবাবদিহি করতে হবে, গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই যার অবগতিতে রয়েছে। যার জ্ঞানের বাইরে কোন কিছুই গোপন নেই।

এই চিন্তা প্রতিটি মূহুর্তে তাদের এ অনুভূতিকে জাগ্রত রাখবে যে, মানুষের উপর নিজেদের হুকুম ও কর্তৃত্ব চালানোর জন্যে, জনগণকে নিজেদের গোলাম বানানোর জন্যে, তাদেরকে নিজেদের সম্মুখে মাথা নত করতে বাধ্য করার জন্যে, তাদের থেকে ট্যাক্স আদায় করে নিজেদের জন্যে বিলাসবহুল আট্টালিকা নির্মাণ করার জন্যে, আর স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিলাসিতা, আত্মপূজা এবং হঠকারিতার সামগ্রী পূঞ্জিভূত করার জন্যে আমাদের উপর খিলাফতের এই মহান দায়িত্ব অর্পিত হয়নি। বরঞ্চ এই বিরাট দায়িত্ব আমাদের উপর এই জন্যে অর্পিত হয়েছে, যেনো আমরা আল্লাহর বান্দাদের উপর তাঁরই দেয়া ইনসাফ ভিত্তিক আইন ও বিধান কার্যকর করি এবং নিজেরা নিজেদের জীবনে তা পুরোপুরি অনুসরণ ও কার্যকর করি। এই বিধানের অনুসরণ এবং তা কার্যকর করার ব্যাপারে আমরা যদি বিন্দুমাত্র ত্রুটি করি, এ কাজে যদি অনূ পরিমাণ স্বার্থপরতা, স্বেচ্ছাচারিতা, বিদ্বেষ, পক্ষপাতিত্ব, কিংবা বিশ্বাসঘাতকতার অনুপ্রবেশ ঘটাই, তাহলে আল্লাহর আদালতে এর শাস্তি অবশ্যি আমাদেরকে ভোগ করতে হবে, দুনিয়ার জীবনে শাস্তি ভোগ থেকে যতোই মুক্ত থাকি না কেন?

এই মহান আদর্শের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় অট্টালিকা তার মূল ও কান্ড থেকে আরম্ভ করে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর শাখা প্রশাখা পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়ে ধর্মহীন রাষ্ট্র (Secular States) থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর হয়ে থাকে। তার গঠন প্রক্রিয়া, স্বভাব প্রকৃতি সবকিছুই সেক্যুলার রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্যে প্রয়োজন এক বিশেষ ধরণের মানসিকতা। এক স্বাতন্ত্রধর্মী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এক অনুপম কর্মনৈপূণ্য। এ রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী, পুলিশ বাহিনী, কোর্ট কাচারী, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, আইন কানুন, কর ও খাজনা পরিচালনা পদ্ধতি, পররাষ্ট্রনীতি, যুদ্ধ, সন্ধি প্রভৃতি সব বিষয়ই ধর্মহীন রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। সেক্যুলার রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি ইসলামি রাষ্ট্রের কেরানী, এমনকি চাপরাশী হবারও যোগ্য নয়।

মোট কথা, ধর্মহীন সেক্যুলার রাষ্ট্র পরিচালনার উপযোগী করে যেসব লোক তৈরি করা হয়েছে এবং সে ধরণের রাষ্ট্রের স্বভাব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে নৈতিক ও মানসিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, ইসলামি রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তারা সম্পূর্ণ অযোগ্য। ইসলামি রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের প্রতিটি বিভাগ, পরিচালনা যন্ত্রের

প্রতিটি অংশ সম্পূর্ণ নতুনভাবে নিজস্ব আদর্শের ভিত্তিতে ঢেলে সাজাতে হবে।

এ রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রয়োজন এমন সব লোকের, যাদের অন্তরে রয়েছে আল্লাহর ভয়। যারা আল্লাহর সম্মুখে নিজেদের দায়িত্ব পালনের বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে বলে তীব্র অনুভূতি রাখে। যারা দুনিয়ার উপর আখিরাতকে প্রাধান্য দেয়। যাদের দৃষ্টিতে নৈতিক লাভ ক্ষতি পার্থিব লাভ ক্ষতির চাইতে অধিক মূল্যবান। যারা সর্বাবস্থায় সেইসব আইন কানুন নিয়মনীতি ও কর্মপন্থার অনুসরণ করবে, যা তাদের জন্যে বিশেষভাবে প্রণীত হয়েছে। তাদের যাবতীয় চেষ্টা তৎপরতার একমাত্র লক্ষ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। ব্যক্তিগত আর জাতিগত স্বার্থের দাসত্ব আর কামনা বাসনার গোলামীর জিঞ্জির থেকে তাদের গর্দান হবে সম্পূর্ণ মুক্ত। হিংসা বিদ্বেষ আর দৃষ্টির সংকীর্ণতা থেকে তাদের মন মানসিকতা সম্পূর্ণ পবিত্র। ধনসম্পদ ও ক্ষমতার নেশায় যারা উন্মাদ হবার নয়। ধনদৌলতের লালসা আর ক্ষমতার লিপ্সায় যারা কাতর হবার নয়।

এইরূপ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে এমন নৈতিক বলিষ্ঠতার অধিকারী একদল লোক প্রয়োজন, পৃথিবীর ধনভান্ডার হস্তগত হলেও, যারা নিখাঁদ আমানতদার প্রমাণিত হবে। ক্ষমতা হস্তগত হলে জনগণের কল্যাণ চিন্তায় যারা বিনিদ্র রজনী কাটাবে। আর জনগণও যাদের সুতীব্র দায়িত্বানুভূতিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণাধীনে নিজেদের জানমাল, ইজ্জত আবরুসহ যাবতীয় ব্যাপারে থাকবে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন।

ইসলামি রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে প্রয়োজন এমন একদল লোকের, যারা কোনো দেশে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করলে সেখানকার লোকেরা গণহত্যা, জনপদের ধ্বংসলীলা, জুলুম নির্যাতন, গুন্ডামী বদমায়েশী এবং ব্যভিচারের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হবেনা। বরঞ্চ বিজিত দেশের অধিবাসীরা এদের প্রতিটি সিপাহীকে পাবে তাদের জানমাল, ইজ্জত আবরু ও নারীদের সতীত্বের পূর্ণ হিফাযতকারী।

এ ধরণের এবং কেবলমাত্র এধরণের লোকদের দ্বারাই ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কেবলমাত্র এরূপ লোকেরাই ইসলামি হুকুমাত পরিচালনা করতে সক্ষম। পক্ষান্তরে বস্তুবাদী স্বার্থান্বেষী (Utilitarian Mentality) লোকদের দ্বারা কিছুতেই একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হতে পারেনা।

বরং রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে এরূপ লোকদের অস্তিত্ব অট্টালিকার অভ্যন্তরে উইপোকার অস্তিত্বের মতোই বিপজ্জনক। এরা পার্থিব স্বার্থ এবং ব্যক্তি ও জাতির স্বার্থে নিত্য নতুন নীতিমালা তৈরি করে। এদের মগজে না আছে আল্লাহর ভয়, না পরকালের। বরঞ্চ তাদের সমগ্র চেষ্টা তৎপরতার এবং নিত্য নতুন পলিসির মূলকথা হচ্ছে কেবলমাত্র পার্থিব লাভ লোকসানের 'ধান্দা'।

এখন, নবিগণের পদাঙ্ক অনুসরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশে ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথ কেমন হতে পারে সে ব্যাপারে আলোকপাতের চেষ্টা করা হবে।

এখানে বাস্তব অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণের আলোকে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক দিক আলোচনা করা হবে। যেহেতু, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে শারঈভাবে ও বাস্তবিকভাবে অকার্যকর ও বাতিল সাব্যস্ত করা হয়, তাই এসংক্রান্ত আলোচনার কোনোই অবকাশ নেই। তাই এ ব্যাপারে আলোচনার কিছু নেই। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনচরিতের আলোকে দাওয়াহ, তরবিয়ত ও সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক-সাংগঠনিক কর্মকৌশলের প্রকাশ আমাদের দেশে কেমন হতে পারে তার বিবরণ নিয়ে আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। তবে কিছু বিষয়ে ধারণা অন্তত প্রয়োজন।

আমরা জানি, তীব্র সংঘাত ছাড়া ইসলাম ও কুফরের দ্বন্দ্বের মীমাংসা হয় না। আমাদের মতো দেশে বারবারই দেখেছি সৈনিক-পেশাজীবী ও ছাত্র-জনতার ঐক্যবদ্ধ আদর্শিক আন্দোলনের পথ ধরেই এপথে সফলতা আসে। তবে মানুষের সত্যের প্রতি দায়বদ্ধতা, মিথ্যার বিরুদ্ধে তীব্র ও শক্তিশালী অবস্থানের ভিত্তিতে যোগ্য, আত্মত্যাগী ও দূরদর্শী নেতৃত্ব ও সংগঠিত শক্তির উপস্থিতি অর্জনের আগে বিচ্ছিন্ন সংঘাত-সহিংসতা কোনো ফলাফল এনে দিবে না। তাই এ পথ কোন ত্বরাপ্রবণ, অতিআবেগীর পথ নয়। তাওহিদের আকিদা, নববি সুন্নাত ও সালাফদের মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্ব ও অনুসারীদের সমন্বয়ে অগ্রসরমান সংগঠন

ব্যতীত দ্বীন কায়েমের আশা করা ভুল। ধারাবাহিক দাওয়াহ, তরবিয়ত, সংগ্রাম ও সংশোধনের পথ ধরেই আদর্শিক দৃঢ়তা, বৈপ্লবিক চেতনা ও রাজনৈতিক জ্ঞান-প্রজ্ঞা অর্জনে সক্ষম সংগঠিত শক্তি গড়ে ওঠে।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে—স্রেফ ক্ষমতা, অর্থ ও প্রতিপত্তি লাভকে উদ্দেশ্য করা সুস্থ চিন্তার কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব না। একজন মুসলিমের জন্য তো নয়ই। আমরা মুসলিমরা আমাদের আদর্শকে বিজয়ী দেখতে চাই। শাসক হবার উদগ্র বাসনার চেয়ে, শরীয়াহ শাসিত হবার আগ্রহই আমাদের বেশি। অর্থাৎ, কেবল ক্ষমতা ও ব্যবস্থার পালাবদল নিজেদের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে হতে পারেনা। বরং, যেহেতু আদর্শিক বিপ্লব ব্যতীত মানুষ ও সমাজের সামগ্রিক পরিবর্তন সম্ভব না, সেহেতু আমরা কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার কথা বলছি মাধ্যম হিসেবে।

[illegible] ?

ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে, রাষ্ট্র একটি জাগতিক বিষয়, যা সর্বজনীন। পার্থক্য শুধু মূল্যবোধের। একটি ইসলামি রাষ্ট্র ইসলামি শরীয়াহর ভিত্তিতে পরিচালিত, কমিউনিস্ট রাষ্ট্র কমিউনিজমের ওপর প্রতিষ্ঠিত। একইভাবে, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথও সুনির্দিষ্ট। আর শরীয়াহ সেদিকেই আহবান করে যাতে আছে দুনিয়া আখিরাত উভয় জগতের কল্যাণ ও মর্যাদা।

তাই, বাস্তবতা উপলব্ধি করে শরীয়াহর পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান অন্যদের তুলনায় সহজ ও দ্রুততমভাবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাবে। কেননা, মুসলিমদের সাথে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার তাওফিক, ওয়াদা ও সাহায্য। আরও রয়েছে সর্বোত্তম পথনির্দেশ—কুরআন ও সুন্নাহ ।

এটাও ইতিমধ্যেই স্পষ্ট যে—সমাজ ও রাষ্ট্রের আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে আদর্শিক বিপ্লব অপরিহার্য। ইতিহাসের আলোকে আদর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন বিপ্লবের কয়েকটি স্তর অতিক্রম করতেই হয় মর্মে আমরা দেখতে পাই। কাঙ্ক্ষিত বৈপ্লবিক পরিবর্তনের রূপরেখার ব্যাপারে একটি ধারণা আমরা এভাবে দেখতে পারি—

১। আদর্শিক দাওয়াহর আত্মপ্রকাশ। যা ন্যারেটিভ বিনির্মাণ, বিপ্লবী আদর্শ ধারণকারী অগ্রগামী ব্যক্তিদের (যাদের অন্তরে দ্বীনের বুঝ ও চেতনা প্রবেশ করেছে। যারা আত্মত্যাগী, দূরদর্শী, জ্ঞানী) সংগঠিত হওয়ার মাধ্যমে শুরু হয়। (মাক্কি যুগের প্রথম ৩, মতান্তরে ৪ বছর রাসুলুল্লাহ (সা) এর গোপন দাওয়াহ-তরবিয়তের স্তরে দেখা যায়)।

২। বিপ্লবী সংগঠিত শক্তির মাধ্যমে সমাজে আদর্শিক দাওয়াহর ব্যাপক প্রচার-প্রসার। এক্ষেত্রে তারা শত প্রলোভন ও বাধার মুখেও সমাজে আদর্শের মূর্তরূপ হিসেবে নিজেদের অবস্থান জানান দেয় ও বিকশিত হতে থাকে। (যা মাক্কি যুগের বাকি সময়ে দেখা গিয়েছে, বাইয়াতে আকাবার আগ পর্যন্ত)

৩। বৈপ্লবিক সংগঠিত শক্তির ধারাবাহিক আত্মত্যাগ ও নেতৃত্বের ফলে সমাজে আদর্শিক মেরুকরণ সম্পন্ন করা হয়। যা সম্পন্ন হবে আত্মত্যাগী, দৃঢ় ও শক্তিশালী দাওয়াহ ও সাংগঠনিক মেহনতের মাধ্যমে।

আমাদের প্রেক্ষাপটে বলতে গেলে—সেক্যুলার রাষ্ট্রযন্ত্রের সাথে বিপ্লবী শক্তির নেতৃত্বে থাকা ইসলামপন্থীদের ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরি হওয়া। (যেমন—২০১৩ এর আগেও হেফাজত শক্তিশালী ছিল। শাহবাগ কেবল তাদের প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে সাহায্য করে।)

৪। মেরুকরণ সম্পন্ন হবার পর বিপ্লবী পরিস্থিতি প্রস্তুতে কর্মসূচি তীব্রতর করা, যেন পূর্বতন ব্যবস্থার প্রতিস্থাপনের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়। এবং পরিস্থিতি ও সামর্থ্য অনুযায়ী তীব্র সংঘাতের পথ মাড়িয়ে পূর্বতন শাসনব্যবস্থাকে পরিবর্তন করা।

৫। শাসনব্যবস্থা প্রতিস্থাপন পরবর্তী কার্যক্রম। এই স্তরটিই সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ধারণ করবে। যে স্তরের জন্যই মূলত পূর্ববর্তী স্তরগুলোর প্রস্তুতি নেয়া হয়।

(মদিনায় খন্দকের যুদ্ধ শেষ হওয়া অবধি এই স্তর ছিল)। যে স্তরেই সাধারণত আপোষ বা ব্যর্থতা বিপ্লবকে নস্যাৎ করে দেয়।

৬। ক্রমাগত শক্তি ও প্রভাব বৃদ্ধি করা। সভ্যতাগত উপাদানগুলো সক্রিয় ও ব্যাপক করা। (সাহাবাদের জীবনের আলোকে যা আমরা দেখি ক্রমান্বয়ে মক্কা বিজয়, পারস্য, রোম, সিরিয়া, স্পেন বিজয়ের মাধ্যমে সুসংহত হওয়ার মাধ্যমে) ।

প্রশ্ন হচ্ছে সমাজে ইতিমধ্যেই বিরাজমান ইসলামি শক্তি উপস্থিত। এছাড়াও বিপ্লবের স্বপক্ষে আওয়াজ তোলার লোকের সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। তাওহিদ ও কুফরের মেরুকরণের ব্যাপারেও মানুষ একদম অজ্ঞ নয়। স্রেফ সামাজিক-রাজনৈতিক পরিসরেই মুসলিমরা সংকটাপন্ন। সেক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত বৈপ্লবিক আন্দোলনকে আধুনিক প্রেক্ষাপটে কিভাবে আমরা বুঝব? সহজভাবে বৈপ্লবিক আন্দোলনকে চার স্তরে বিন্যস্ত করা যায়–

- মেরুকরণ (Polarisation):

  সাম্রাজ্যবাদী বা আধিপত্যবাদী শক্তির তাঁবেদার সেক্যুলার শাসনব্যবস্থা ও তার সর্বব্যাপী জুলুমের বিরুদ্ধে মেরুকরণ তৈরিতে কাজ করতে হবে। এবং বিপ্লবের উপযুক্ত নেতৃত্ব ও সংগঠিত শক্তির বিকাশ ঘটতে হবে। আর এমনটা গণমানুষকে সঠিক ইসলামি দাওয়াহ ও ন্যারেটিভের আলোকে ঐক্যবদ্ধ করার মাধ্যমে অর্জন করতে হবে। আর রাজনৈতিক মেরুকরণ সম্পন্ন করার পূর্বশর্ত হচ্ছে—ইসলাম ও মুসলিমদের সামজিকভাবে আধিপত্য অর্জন।

  বাংলাদেশের ইতিহাসের আলোকে বলতে গেলে—'৭১ এ বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রেক্ষাপট তৈরিতে '৬০ এর দশকে (৬২-৭০) স্বাধীকার আন্দোলনই মূল ভূমিকা রেখেছিল।

- তীব্রতাবৃদ্ধি (Escalation):

  শাসকগোষ্ঠী ও তার সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে মোকাবিলার সক্ষমতা অর্জন সম্ভব হলে আন্দোলনের দাবি ও প্রকৃতিকে তীব্র করে তোলা। সাধারণত এমন অবস্থায় জনবিচ্ছিন্ন শাসকগোষ্ঠী প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে থাকে। এমতাবস্থায় জনরোষ প্রচন্ড হয়ে উঠতে থাকে স্বল্প সময়ের ব্যাবধানে।

  যেমনটা আমরা দেখেছি '৭১ সালের মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতার মুহূর্ত তৈরিতে।

- অভ্যুত্থান (Upheaval):

  আন্দোলন তীব্রতা বৃদ্ধির চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে গেলে, যালিম শাসকের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান সম্পন্ন হবে; তখন তাদের মাঝে থাকা বিপ্লবীদের নেতৃত্বে জনমানুষকে সাথে নিয়ে বিপ্লবী শাসনব্যবস্থা কায়েম হবে। যেমন—আরব বসন্তে মিশর ও তিউনিশিয়াতে দেখা গেছে। বা '৯০ এর এরশাদবিরোধী অভ্যুত্থানে দেখা গেছে।

  ক্ষেত্রবিশেষে অরাজকতাও সৃষ্টি হতে পারে। যেমন ২৫শে মার্চের কথা বলা যায়। সেক্ষেত্রে জনযুদ্ধের মাধ্যমেই অভ্যুত্থান সম্পন্ন হবে।

- প্রতিষ্ঠালাভ (Consolidation):

  অভ্যুত্থান পরবর্তী অরাজক অবস্থার যথাযথ ব্যবস্থাপনা, পূর্বের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর বিলোপ ঘটিয়ে নতুন বিপ্লবী সরকার গঠন ও ক্ষমতা সুসংহতকরণ। এক্ষেত্রেই সাধারণত দুর্বলতা দেখা যায় এবং অভ্যুত্থান আর বিপ্লবে পরিণত হতে পারেনা।

বিপ্লবের সফলতা, ব্যর্থতার অনেক কিছুই নির্ভর করে 'মেরুকরণ' স্তরে সুসংগঠিত ও ধারাবাহিক বিপ্লবী মেহনতের উপর। এই স্তর বিপ্লবী আন্দোলনের সবচেয়ে কষ্টকর ও দীর্ঘায়িত স্তর। এস্তরে ধারাবাহিক ও ক্রমবিকশিত কর্মসূচীর মাধ্যমে আদর্শিক, রাজনৈতিক

সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী সংগঠন ও নেতৃত্ব গড়ে ওঠে। এবং এই স্তরেই জনসাধারণের চিন্তার জগতে বিপ্লবের বীজ বপন করা হয়। এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা অন্য কোনো সময় করা যাবে। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে, পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়েই ধারাবাহিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচী নির্ধারণ করতে হবে। এটি এমন একটি মূলনীতি যে ব্যাপারে মাও সে তুং ও চে গুয়েভারা উভয়েই একমত—

> The matters on which they agree are: The population as the key to victory, the importance of political, and the importance of context when developing strategy.

আসলে, ব্যাপকভাবে জনসমর্থন আদায় সম্ভব হলে জনসাধারণ, সামরিক ও সরকারি বাহিনীর উন্নত অংশ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এগিয়ে আসে এবং বিপ্লবে নিয়ামক ভূমিকা রাখে। এ পরিস্থিতি উদ্ভুত হবার আগে ক্রমান্বয়ে বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। পাশাপাশি বিপ্লবী আন্দোলন এগোতে হবে সঠিক ও যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তোলার মাধ্যমে।

সালাহুদ্দিন জায়দান বলেন,

> বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য অবশ্যই যোগ্য নেতৃত্ব, সংগঠিত সংগঠন এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ আত্মরক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে। আর এই মৌলিক উপকরণটির অভাবের কারণেই আরব বিপ্লব রাষ্ট্রীয় শোষণের নিচে চাপা পড়ে যায় এবং জনসাধারণের আশা নিরাশায় পরিণত হয়।

আমরা ইতিহাস ও রাজনৈতিক বাস্তবতার আলোকে দেখতে পাই সমাজে বিদ্যমান বিরোধ বা দ্বন্দ অনিবার্যভাবেই বৈপ্লবিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট অনিবার্য করে তোলে।

ব্যবহারিক রাজনীতির জন্য প্রাচীণ বামপন্থা (অর্থোডক্স লেফট) বিপ্লবের পরিণতি লাভের প্রশ্নকে দুই ভাগে ভাগ করে—

√ Objective Condition: একটি হচ্ছে বিপ্লবের বাস্তব পরিস্থিতি যা নৈর্ব্যক্তিক অবস্থা (Objective Condition) নামে পরিচিত। যা নানা রকম বিচ্ছিন্ন ও স্বতঃস্ফূর্ত আর্থ-সামাজিক ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে তৈরী হয়। যেমন, ২০১৪ থেকে ২০২৪ এর জুলাই অবধি বিএনপি-জামাআতের মতো বুর্জোয়া লিবারেল দলগুলোর আন্দোলন ও হাসিনার স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে বিপ্লবের উপযোগী পরিস্থিতি তৈরি হয়।

বিপ্লবের Objective condition স্বতঃস্ফূর্তভাবেও হাজির হতে পারে। যেমন, ২০১৩ সালের হেফাজতে ইসলামির উত্থান এমন পরিস্থিতি তৈরি করেছিল অনেকটা (শাহবাগের উত্থানের ফলে) প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন হিসেবে। একইভাবে হাসিনা শাসনের বিরুদ্ধে জুলাই'২৪ এও একই ঘটনা দেখা যায়।

√ Subjective Condition: অপর দিক হচ্ছে রাজনৈতিক চেতনা ও সাংগঠনিক শক্তির বাস্তবতা (Subjective Condition)। অর্থাৎ, বৈপ্লবিক শক্তির সক্ষমতা পরিমাপের আলোকে নির্ধারিত অবস্থা। বিপ্লবী আদর্শ, লক্ষ্য ও পরিকল্পনার আলোকে গড়ে ওঠা সংগঠিত শক্তির জন্য অব্জেক্টিভ কন্ডিশনকে কাজে লাগিয়ে বিপ্লব সম্পন্ন করার সক্ষমতা আছে কি না। অর্থাৎ, বিপ্লবের উপযোগী পরিস্থিতি কেবল রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপরই নয়, বরং বিপ্লবী শ্রেনীর আদর্শিক-রাজনৈতিক চেতনা এবং বিপ্লব সম্পাদনে সক্ষমতার উপরও নির্ভর করে। বিপ্লবীরা কি অভ্যুত্থানের পর যথাযথ সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচী গ্রহণের (প্রতিবিপ্লব প্রতিহত করা, অরাজকতা দূরীকরণ এবং সমাজকে সম্পৃক্ত করে বিপ্লবী আদর্শের আলোকে রাষ্ট্রগঠন) মাধ্যমে লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম কি না, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

উদাহরণত, আরব বসন্ত বা '৬৯ ও '৯০ এর গণআন্দোলনে আদর্শ ও পরিকল্পনা ছিল না। তাই শুধু অভ্যুত্থান সম্পন্ন হয়েছে, বিপ্লবী লক্ষ্য হাসিল হয়নি।

তবে, সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও লক্ষ্য না থাকলেও উলামায়ে কেরাম, দাঈদের মেহনত (অনলাইন, অফলাইন অ্যাক্টিভিজম) নি:সন্দেহে বিপ্লবের অব্জেক্টিভ কন্ডিশনকে ত্বরান্বিত করে।

কিন্তু বিপ্লবী আদর্শ, তত্ত্ব ও চেতনার আলোকে বিকশিত সক্ষম সংগঠিত শক্তি ও রাজনৈতিক বাস্তবতার সমন্বয় ব্যতীত কাঙ্ক্ষিত ফলাফল কখনোই আসার নয় আসলে।

সহজভাবে বুঝতে—

In short, in order for a revolutionary situation to turn into a revolution that will replace the old system, the subjective factor must be ripe enough. In other words, there must be a *correct leadership and the *revolutionary class must have a sufficient level of political consciousness and organisation.

বিপ্লবের উপযোগী পরিস্থিতি (অর্থাৎ যখন war of position থেকে war of maneuver এ শিফট করা হবে,) কখন হাজির হবে? অর্থাৎ, বিপ্লবের নৈর্ব্যক্তিক পরিস্থিতি (Objective Condition) ও বাস্তব পরিস্থিতি (Subjective Condition) উভয়ই উপস্থিত হবার আলামত কি?

লেনিনের বক্তব্য অনুযায়ী বিপ্লবী পরিস্থিতির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোকে আমাদের মতো করে সাজালে যা পাওয়া যায়:

ক. নিপীড়িত জনগণ যখন পুরাতন কায়দায় জীবনযাপন অসম্ভব মনে করবে।

খ. শাসকেরা আর পুরাতন কায়দায় তাদের শাসন চালাতে সক্ষম হবে না।

গ. সুবিধাবাদ ও সামাজিক-উগ্র জাতিবাদকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্থ করে, ইসলামপন্থীদের অগ্রবাহিনী, বিভিন্ন শক্তির কেন্দ্র ও ধারাসমূহকে আদর্শগতভাবে প্রস্তুত হতে হবে।

ঘ. অবস্থা এমন যে, বিপ্লবী অগ্রবাহিনীর সমর্থনে ইসলামপন্থী শ্রেণি ও জনসাধারণ এগিয়ে আসবে এবং সমাজের মূখ্য স্টেকহোল্ডাররা (সামরিক বাহিনী, আমলাতন্ত্র ইত্যাদি) বিপ্লবকে মেনে নিবে, সক্রিয় বিরোধিতা বা প্রতিহত করতে আসবে না।

ঙ. জনগণকে এই নতুন অবস্থানে টেনে আনার জন্যে অগ্রবাহিনীর মধ্যে ইসলামপন্থীদের তত্ত্ববাগিশতা এবং তার ভুলত্রুটিসমূহকে নির্মূল ও দূরীভূত হবে।

চ. তোতা পাখির মতো করে আবৃত্তি ও পুনারাবৃত্তি করা 'বিক্ষুব্ধ' রাজনৈতিক/ কৌশলগত রেটোরিক শুনে শুধু নয়, নিজেদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে অর্জিত বোধের আলোকে জনগণকে উপলব্ধি করানো হবে—"বিপ্লব কেন প্রয়োজন এবং কেন তারা বিপ্লবের ক্ষেত্রে বিপ্লবী শ্রেণির এই অগ্রবাহিনীকে সমর্থন করবেন।"

ছ. বিপ্লবের বিরুদ্ধে যে শক্তিসমূহ আছে সেই সম্ভাব্য প্রতিবিপ্লবী শক্তিসমূহের (যেমন, সামরিক বাহিনীর ইসলামবিরোধী ও দেশবিরোধী অংশ, পশ্চিমা বা ভারতীয় চিন্তায় প্রভাবিত লিবারেল রাজনৈতিক দলসমূহ—যারা ইসলামপন্থীদের মেহনত ও কুরবানির ফল নিজেদের ঘরে তুলতে চাইবে), নিজেদের মধ্যে বিপ্লব প্রশ্নে এমন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবে যার কোনো মীমাংসার পথ থাকবে না এবং যার ফলে তারা নিজেরা দুর্বল হয়ে পড়বে। বিপ্লবকে মেনে নেয়ার বিকল্প তাদের থাকবে না।

জ. সেক্যুলার শাসকগোষ্ঠী ছাড়াও সমস্ত দোদুল্যমান এবং অদৃঢ়, শিথিলপন্থী সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তিসমূহ (যেমন—জামায়াতে ইসলামি-বিএনপির মতো দল, মিডিয়া, একাডেমিয়া ইত্যাদি) নিজেদের রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার মাধ্যমে জনগণের চোখে যথেষ্ট পরিমাণে উলঙ্গ, খেলো এবং মর্যাদাহীন হয়ে পড়বে।

ঝ. ব্যাপকভাবে বিপ্লবী শ্রেণির মধ্যে দৃঢ়, সাহসী এবং একনিষ্ঠ বিপ্লবী সংগ্রামের একটা চেতনার দ্রুত বিকাশ ও বৃদ্ধি ঘটবে। লেনিনের মতে,

উপরোক্ত শর্তগুলো পূরণ হওয়ার ফলে যে বিপ্লবী পরিস্থিতি (Objective Condition) সৃষ্টি হবে সেই

পরিস্থিতিতে সামগ্রিক অবস্থাকে (Subjective Condition) যথাযথভাবে পরিমাপ করে চূড়ান্ত সংগ্রামের সঠিক মুহূর্তটি যদি সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় একমাত্র তাহলেই সাফল্য অর্জিত হবে, অর্থাৎ বিপ্লব ঘটবে, অন্যথায় নয়।

ঞ. মুসলিমদের অনুসরণীয় উলামায়ে কেরাম, তালেবে ইলম, দাঈ-অ্যাক্টিভিস্ট ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে (সর্বোপরি জনসাধারণকে) বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে হবে এবং তার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। উদ্ভূত পরিস্থিতিই যেন তাদেরকে অনুপ্রাণিত করে সেটা খেয়াল রাখা গেলে, তা অর্জন তুলনামূলক সহজ হবে।

ট. শাসক শ্রেণিসমূহকে এমন একটি রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে পড়তে হবে যা জনগণের সব থেকে পশ্চাৎপদ অংশকেও রাজনীতিতে টেনে আনবে, সরকারকে দুর্বল করবে এবং বিপ্লবীদের দ্বারা তার দ্রুত উচ্ছেদকে সম্ভব করবে।

আশা করি দ্বীনের কর্তৃত্ব অর্জনের লক্ষ্যে বিপ্লবী আন্দোলনের রূপরেখা কেমন হতে পারে, প্রাথমিকভাবে তার একটি ধারণা সংক্ষেপে তুলে ধরা সম্ভব হলো। আর বিস্তারিত আলোচনার স্থানও এটি নয়।

আর সবশেষে যা না বললেই নয়, এ লক্ষ্য অর্জনে বিশুদ্ধ আকিদা, সুনির্দিষ্ট মানহাজ ও পরিকল্পনার আলোকে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সংগঠিত শক্তি হিসেবে গড়ে ওঠা এবং দ্বীন কায়েমের পথে সার্বক্ষনিক ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক দায়িত্বের প্রতি সজাগ থাকা অপরিহার্য।

[৫]

আমাদের ইমামরা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে "জীবনের প্রতি আসক্তি আর মৃত্যুর ভয়কে পদদলিত করতে সক্ষম মুজাহিদ্বীনদের জামাত ছাড়া মানবতার উদ্ধার ও অস্তিত্ব রক্ষার আশা কিছুতেই করা যায় না।"

দুনিয়ার তুচ্ছতা, আত্মপ্রেম আর আত্মকেন্দ্রিকতার ভয়াবহতা উপলব্ধি করা ছাড়া ইসলামের মহান দাওয়াত ও আন্দোলনের সফলতার কথা চিন্তা করা অসম্ভব। আর নিজের প্রতিষ্ঠা বা প্রসারের পরিবর্তে আল্লাহর দ্বীনের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার ফিকর ব্যতীত আমরা সফল হব না এটাও মনে রাখা জরুরী।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَ هُوَ الَّذِیۡ جَعَلَکُمۡ خَلٰٓئِفَ الۡاَرۡضِ وَ رَفَعَ بَعۡضَکُمۡ فَوۡقَ بَعۡضٍ دَرَجٰتٍ لِّیَبۡلُوَکُمۡ فِیۡ مَاۤ اٰتٰىکُمۡ ؕ اِنَّ رَبَّکَ سَرِیۡعُ الۡعِقَابِ ۖ وَ اِنَّہٗ لَغَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ

আর তিনি সে সত্তা, যিনি তোমাদেরকে জমিনের খলীফা বানিয়েছেন এবং তোমাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদা দিয়েছেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে যা প্রদান করেছেন, তাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন। নিশ্চয় তোমার রব দ্রুত শাস্তিদানকারী এবং নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আনআম, ৬:১৬৫)

অর্থাৎ, মাঝে মেধা, শক্তি, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, সম্পদ ইত্যাদি নিয়ামতের তারতম্যের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা মানবজাতিকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করেছেন। কারো সম্পদ আছে বেশী তো মেধার স্বল্পতা রয়েছে, কারো জ্ঞানের প্রাচুর্য রয়েছে তো শারীরিক শক্তির ঘাটতি রয়েছে। মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ তা'আলা এভাবে একজনকে আরেকজনের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

তাই প্রত্যেকের জন্য ওয়াজিব হল, তাকে যা দেয়া হয়েছে তার সবটুকু দিয়ে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের মেহনতে অগ্রসর হওয়া। আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সততা বজায়কারী প্রত্যেকের জন্য অবশ্যক, ব্যক্তি পর্যায় থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত তাওহিদ বাস্তবায়নের দাওয়াতের পথে নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়া।

বেঁচে থাকার তা কতই না মহান উদ্দেশ্য।

মৃত্যুবরণের জন্য কতই না উপযুক্ত এই কারণ।

ইসলামের পুনর্জাগরণের এই শতাব্দীতে কোনো মুসলিমই, বিশেষত মুজাহিদদের পথের অনুসারীগণ যেন বিপ্লবী আন্দোলনের পথে কোনো প্রচেষ্টা বা সুযোগকে হাতছাড়া না করেন। বাহ্যত তা যতই হালকা মনে হোক না কেন। উদাসীনতা, গাফেলতির ব্যাধি যেহেতু আজ ব্যাপক, তাই সময়গুলো বিপ্লবী মেহনতে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে আমাদের অনেক বেশী সচেতন ও উদ্যমী হওয়া কাম্য। নিশ্চয় আদম সন্তান কিছু সময়েরই সমষ্টি। তার একটি দিন চলে যাওয়া মানে নিজ সত্তার একটি অংশও চলে যাওয়া।

"পরে করব" বা "এখন থাকুক" মানসিকতা সম্পূর্ণই পরিত্যাজ্য। কেননা এই মহান আমানত এতই ভারী যার আহ্বানে আমাদের ইমাম, নবিগণের সর্দার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিছানা ছেড়ে দাঁড়িয়েছিল এবং দুনিয়া ত্যাগের আগ পর্যন্ত ন্যূনতম বিশ্রামও গ্রহণ করেননি।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ

হে বস্ত্রাবৃত!

فَأَنذِرْ قُم

উঠ, অতঃপর সতর্ক কর।

(সূরা মুদ্দাসসির, ৭৪:১-২)

উস্তাদ সাইয়্যিদ কুতুব (رحمه الله) বলেন,

"মুসলিম জাতির নেতৃত্ব দানের অক্ষমতার কারণে মানবতা আজ মহাদুর্যোগ ও অধঃপতনের শিকার হয়েছে। মানবতার অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই আজ বিশ্বনেতৃত্বের পরিবর্তন প্রয়োজন। প্রয়োজন ইসলামের সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তনের, যার আবির্ভাব ঘটেছে মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এবং জাহেলিয়াত থেকে জ্ঞান ও অন্তর্জ্ঞানের দিকে বের করে আনার জন্য।

পৃথিবীতে (ও সকল জাতিতে) ইসলামের নেতৃত্ব অপরিহার্য এবং এর অনুপস্থিতির কারণে শুধু মুসলিম জাতি নয়, বরং সমস্ত মানব জাতি ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। বস্তুত এই জাতির পরিধি এত ব্যাপক ও বিস্তৃত যে তা সবকিছুকেই ঘিরে আছে"।

অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় এই দাওয়াতের সত্যতা, শ্রেষ্ঠত্ব, গুরুত্ব এবং প্রয়োজন অনুধাবন করা এখন অনেক সহজ। জাহেলিয়াতের কদর্যতা ও বাস্তবতা উৎকটভাবে আজ প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে। বস্তুবাদী ও ভোগবাদী জীবনের অনাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে মানুষ।

ইসলামি উম্মাহর সামনে আজ তার ছিনতাই হওয়া নেতৃত্ব পুনরুদ্ধার করার সর্বোত্তম সময় ও সুযোগ। যদি উম্মাহ'র (নিবেদিতপ্রাণ দা'ঈরা) উঠে দাঁড়ায় এবং ইখলাস, আত্মত্যাগ, উদ্যম ও সংকল্পের সঙ্গে (তাওহিদ ও শরীয়াহর কর্তৃত্বের) দাওয়াত বুকে ধারণ করে জাতিকে আহ্বান করে আস্থার সাথে, দরদের সাথে, মমতার সাথে, কল্যাণকামিতার সাথে; যুক্তি, শ্রদ্ধা আর আচরণ দিয়ে যদি বোঝাতে পারে যে, এটাই একমাত্র পথ যা জাতিকে পতন ও অধঃপতনের চরম পরিণতি থেকে রক্ষা করতে পারে, তবে শীঘ্রই উম্মাহ'র হারানো নেতৃত্ব পুনরুদ্ধার করা সম্ভব, ইন শা আল্লাহ।

কবির ভাষায়,

এ ভূমি এখন বড় সিক্ত, উর্বর ও উপযোগী,

চাই শুধু উন্নত বীজ আর দরদী কৃষক।”

তাই নবিগণের প্রকৃত বিপ্লবী উত্তরসূরীরা ঈমান ও দাওয়াতের শক্তি এবং আল্লাহ্ তা’আলার নুসরতকে সঙ্গী করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার মহান আমানত পূরণে হবেন আগের চেয়েও আরও উদ্যমী ও দৃঢ়।

ইসলামের পথ কিছু নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মেহনত ও কুরবানীকে সমর্থন করে না। এ পথের বাস্তবতা এমন নয় যে, কোনো ব্যক্তি বা জামাত কিছু সময় চেষ্টা সংগ্রাম করার পর আরাম-আয়েশ ও অবসর যাপনের দিকে মনোনিবেশ করবে। নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য নানাভাবে ব্যাখ্যা করতে থাকবে যে—‘সে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করে ফেলেছে এবং বাকিরা এসে তার পথ ও সফর পরিপূর্ণ করে দিবে।’

এভাবেই শয়তান এসকল ধারণাকে সুশোভিত করে। এমনটা কখনই ইসলামি চিন্তা-ফিকরের ফলাফল নয়! নিশ্চয়ই ইসলামের পথ এমন নয়। বরং ইসলাম হলো অবিরত চেষ্টা-সংগ্রাম, আত্মত্যাগ ও জিহাদের নাম, যা চলমান থাকবে দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত, আজীবন।

একজন দা’ঈ পরোয়া করেনা সে জীবনে তার দাওয়াতের পূর্ণাঙ্গতা দেখে যেতে পারলো কি না। কেননা সে জানে, দা’ঈদের ইমাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের রোম ও পারস্য বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছিলেন কিন্তু নিজে জীবদ্দশায় তা দেখে যাননি। একইভাবে, আমাদের ইমাম শায়খ আব্দুল্লাহ আজ্জাম রাহঃ, উস্তাদ সাইয়্যিদ কুতুব রাহঃ এর দাওয়াত পূর্ণাঙ্গতা পাওয়ার পূর্বেই শাহাদাত বরণ করেছেন। কিন্তু উনাদের যোগ্য উত্তরসূরিগণ তাওহিদের আমানত বহন করে সমগ্র দুনিয়াতে তা ছড়িয়ে দিয়েছেন।

আমাদের কর্তব্য এই মহান পূর্বসূরিদের দাওয়াতকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ, তাওহিদ প্রতিষ্ঠার বিশুদ্ধ মানহাজ তথা দাওয়াহ ও জিহাদের পথকে সম্ভাব্য সকল উপকরণকে কাজে লাগিয়ে শক্তিশালী ও বিস্তৃত করা, যেন কাংখিত বিপ্লব সম্পন্ন হয়ে যায় এবং আল্লাহ তা’আলার ক্ষমা লাভ হয়ে যায়।

اِذَا جَآءَ نَصۡرُ اللّٰهِ وَالۡفَتۡحُ ۙ
وَرَاَيۡتَ النَّاسَ يَدۡخُلُوۡنَ فِىۡ دِيۡنِ اللّٰهِ اَفۡوَاجًا ۙ
فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَاسۡتَغۡفِرۡهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۝

“যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। আর আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন; তখন আপনি আপনার রবের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি তাওবা কবুলকারী।” (সূরা আন-নাসর, ১১০:০১-০৩)

প্রত্যেক আন্তরিক ইসলামপন্থীর জন্য আবশ্যক যে, ব্যক্তি ইসলামের পথে বিপ্লবী মেহনতে সময় ও শ্রমের সবটুকু ব্যয় করবে। মুসলিমরা প্রকৃত শান্তির খোঁজ একমাত্র জান্নাতে পাবে। আর এ বিষয়টি উপলব্ধি করা যায় পবিত্র কুরআনের ঐ আয়াতগুলো থেকে যেখানে আল্লাহ তা’আলা ও তাঁর বান্দাদের সাথে মধ্যকার ক্রয়-বিক্রয়ের কথা বলেছেন। আল্লাহ তা’আলা বলেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ اشۡتَرٰى مِنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ اَنۡفُسَهُمۡ وَ اَمۡوَالَهُمۡ بِاَنَّ لَهُمُ الۡجَنَّةَ ؕ يُقَاتِلُوۡنَ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ فَيَقۡتُلُوۡنَ وَ يُقۡتَلُوۡنَ ۟ وَعۡدًا عَلَيۡهِ حَقًّا فِى التَّوۡرٰىةِ وَ الۡاِنۡجِيۡلِ وَ الۡقُرۡاٰنِ ؕ وَ مَنۡ اَوۡفٰى بِعَهۡدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسۡتَبۡشِرُوۡا بِبَيۡعِكُمُ الَّذِىۡ بَايَعۡتُمۡ بِهٖ ؕ وَ ذٰلِكَ هُوَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِيۡمُ

নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য রয়েছে

জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। অতএব তারা মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। আর নিজ ওয়াদা পূরণে আল্লাহর চেয়ে অধিক কে হতে পারে? সুতরাং তোমরা (আল্লাহর সংগে) যে সওদা করেছ, সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং সেটাই মহাসাফল্য। (সূরা তাওবা, ৯:১১১)

অতএব ক্রয়-বিক্রয় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে এবং চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়ে গেছে; এতে কোন ধরনের কমবেশী করার সুযোগ নেই, নেই প্রত্যাহারের সুযোগ। উপরের বিষয়টি যদি আমরা ভালোভাবে অনুধাবন করে থাকি তো আমরা নিম্নোক্ত হাদীসের মর্মও বুঝতে সক্ষম হবো ইন শা আল্লাহ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ-

إنما الناسُ كإبلٍ مائة لا تكاد تجدُ فيها راحلةً. متفق عليه

“নিশ্চয়ই মানুষ এমন একশোটি উটের ন্যায়, যেগুলোর মধ্যে হতে আরোহনযোগ্য একটি উট পাওয়া যাওয়াও দুর্লভ।” (বুখারী, মুসলিম)

অর্থাৎ আল্লাহ তা’আলার তাওফিকপ্রাপ্ত বান্দারা হলেন এমন বাহনের ন্যায়, যা সফরের কষ্ট সহ্য করতে পারে এবং শেষপর্যন্ত গন্তব্যে পৌছাতে পারে।

আর সর্বোত্তম কথা তা ই, যা আল্লাহ তা’আলা বলেন,

فَاصۡبِرۡ اِنَّ وَعۡدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ لَا يَسۡتَخِفَّنَّكَ الَّذِيۡنَ لَا يُوۡقِنُوۡنَ

“অতএব আপনি সবর করুন, নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আর যারা দৃঢ়বিশ্বাসী নয় তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে।” (সূরা আর-রুম, ৩০:৬০)

এই আয়াতের ব্যাপারে আল্লামা সা’দি (রহ.) বলেন,

“সুতরাং আপনাকে যে কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাতে ধৈর্য ধারণ করুন এবং আল্লাহর পথে দাওয়াতেও লেগে থাকুন। তাদের কাছ থেকে বিমুখ হওয়া দেখলেও তা যেন আপনাকে আপনার কাজ থেকে বিমুখ না করে। আর বিশ্বাস করুন যে, আল্লাহর ওয়াদা হক। এতে কোন সন্দেহ নেই। এটা বিশ্বাস থাকলে আপনার পক্ষে ধৈর্য ধারণ করা সহজ হবে।

কারণ, বান্দা যখন জানতে পারে যে, তার কাজ নষ্ট হচ্ছে না, বরং সে সেটাকে পূর্ণমাত্রায় পাবে, তখন এ পথে যত কষ্টের মুখোমুখিই সে হোক না কেন, সে সেটাকে ভ্রক্ষেপ করবে না, কঠিন কাজও তার জন্য সহজ হয়ে যায়, বেশী কাজও তার কাছে অল্প মনে হয়, আর তার পক্ষে ধৈর্য ধারণ করা সহজ হয়ে যায়।”

এবং, আল্লাহ তা’আলা বলেন,

فَاصۡبِرۡ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الۡعَزۡمِ مِنَ الرُّسُلِ وَ لَا تَسۡتَعۡجِلۡ لَّهُمۡ ؕ كَاَنَّهُمۡ يَوۡمَ يَرَوۡنَ مَا يُوۡعَدُوۡنَ ۙ لَمۡ يَلۡبَثُوۡۤا اِلَّا سَاعَةً مِّنۡ نَّهَارٍ ؕ بَلٰغٌ ۚ فَهَلۡ يُهۡلَكُ اِلَّا الۡقَوۡمُ الۡفٰسِقُوۡنَ

“অতএব আপনি সবর করুন যেমন সবর করেছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ। আর আপনি তাদের জন্য তাড়াহুড়ো করবেন না। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা যেদিন তারা দেখতে পাবে, সেদিন তাদের মনে হবে, তারা যেন দিনের এক দণ্ডের বেশী দুনিয়াতে অবস্থান করেনি। এ এক ঘোষণা, সুতরাং পাপাচারী সম্প্রদায়কেই কেবল ধ্বংস করা হবে।” (সূরা আল-আহক্বাফ, ৪৬:৩৫)

---

[1] সহীহ মুসলিম, পৃ: ৮২৪, হাদীস নং: ৪৯৫৭